তিন গোয়েন্দার আরেকটি রহস্যকাহিনী

ইন্দ্রজাল

রকিব হাসান

অদ্ভুত এক মড়ার খুলি, কথা বলে।
অনেকেই চায় ওটা।
[illegible]
... চায় ...
কিন্তু গাড়ি নিয়ে সারাক্ষণ তিন গোয়েন্দাকে যে অনুসরণ করছে
অন্ধকারে ভেরোনার লোকগুলো, তারা কেন চায়?
জটিল রহস্য, খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই।
মুসার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও খুলিটা রেখে দিতে
চেয়েছিলো কিশোর। কিন্তু মেক্সিকানটিকে কখন টিটকারি
মেরে বসলো হতচ্ছাড়া খুলি, আর কথা বলে না।
বিদায় করে দিতেই হলো।
জানলো না তিন গোয়েন্দা, কি ভয়ানক বিপদ
ঘনিয়ে আসছে তাদের মাথার ওপর।

আঠারো টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Bangla E-Library

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোনো বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটা সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকায় পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও অসুবিধে নেই, তবে নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্বিঘ্নে পাঠিয়ে দিন।
—প্রকাশক

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কারো বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক

এক

'নীলাম ডাকা হতে দেখেছো কখনও?' হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর পাশা।

'না,' বললো রবিন মিলফোর্ড।

মুসা আমানও মাথা নাড়লো।

'আমিও দেখিনি,' বললো কিশোর। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আজ সকালে নীলাম ডাকবে সাইফার অকশান কোম্পানি। ট্রাংক, সুটকেস, আরও নানারকম জিনিস। হোটেলের রুমে ফেলে গেছে ওগুলো লোকে। আসলে পালিয়েছে। বিল টিল দিতে পারেনি হয়তো, ফেলে রেখেই চলে গেছে। ইনটারেসটিং।'

'কোনটা?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'লোকের পুরনো কাপড়?'

'নীলাম-টিলাম বাদ দাও,' রবিন বললো। 'তার চেয়ে চলো সাঁতার কাটিগে।'

'নতুন অভিজ্ঞতা হবে আমাদের,' যুক্তি দেখালো গোয়েন্দা-

প্রধান। 'আর গোয়েন্দাদের অভিজ্ঞতা যতো বেশি থাকে ততো ভালো। বোরিসকে বলবো, ছোট ট্রাকটায় করে আমাদেরকে হলিউডে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

ইয়ার্ডে কাজের চাপ কম। বলতেই রাজি হয়ে গেল বোরিস।

সুতরাং, ঘন্টাখানেক বাদে বিশাল এক ঘরে এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। লোকে গিজগিজ করছে। উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে, মোটা এক লোক, সে-ই নীলাম ডাকছে। এক কোণে স্তূপ করে রাখা পুরনো ট্রাংক, সুটকেস, বাক্স।

সামনের টেবিলে নতুন একটা সুটকেস। সেটা দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে লোকটা, 'গেল, গেল, এতো সুন্দর নতুন জিনিসটা চলে গেল। সাড়ে বারো ডলার, এক···সাড়ে বারো ডলার, দুই···সাড়ে বারো ডলার, তিন।'

হাতের কাঠের হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে জোরে বাড়ি মারলো সে।

লাল নেকটাই পরা একজন লোক এসে টাকা মিটিয়ে দিয়ে সুটকেসটা নিয়ে গেল।

'এবার আসছে আটানব্বুই নম্বর জিনিসটা,' সুরেলা কণ্ঠে বললো নীলামকারী। 'লেডিজ অ্যাণ্ডজেন্টলমেন, দারুণ জিনিস। এমন জিনিস কমই দেখেছেন। এই,' সহকারীদের দিকে চেয়ে বললো, 'তুলে আনো এখানে। সবাই দেখুক।'

ছোট, পুরনো একটা ট্রাংক ধরাধরি করে তুলে আনলো দু'জন সহকারী।

নড়েচড়ে উঠলো মুসা। দিনটা ভীষণ গরম। ঘরে, জনতার ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ভালো লাগছে না তার। লোকের আগ্রহ দেখে অবাক হচ্ছে। ফালতু কতগুলো জিনিসের জন্যে···দূর! কিশোরের হাত ধরে টানলো, 'চলো, চলে যাই।'

'আরেকটু,' বললো কিশোর। 'জিনিসটা পছন্দ হয়েছে আমার। ভাবছি, ডাকবো।'

'ওটা!' ট্রাংকটার দিকে আরেকবার তাকালো মুসা। 'পাগল হয়েছো?'

'ডাকবো,' আগের মতোই বললো কিশোর। 'দেখি, কিনতে পারি কিনা। ভেতরে কিছু পেলে আমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে নেবো। ঠিক আছে?'

'ভাগাভাগি? আছে কি ঘোড়ার ডিম ওটার মধ্যে? হয়তো শ'খানেক বছরের পুরনো কিছু কাপড়। ওগুলো কে নেবে?' বললো রবিন।

অনেক পুরনো দেখাচ্ছে ট্রাংকটা। কাঠের তৈরি, চামড়ায় মোড়া। ডালা লাগানো, তালা বন্ধ।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান,' চেঁচিয়ে চলেছে নীলামকারী. 'এই ট্রাংকটা দেখুন। কি সুন্দর। বিশ্বাস করুন, এরকম জিনিস আর আজকাল কেউ বানায় না।'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। ঠিকই বলেছে লোকটা। এখন আর এ-ধরনের ট্রাংক বানানো হয় না। জিনিসটার বয়েস পঞ্চাশ বছরের ওপর তো নিশ্চয় হয়েছে।

'কোনো অভিনেতার ট্রাংক,' ফিসফিস করে দুই সহকারীকে বললো কিশোর, 'মনে হচ্ছে। ওরকম ট্রাংকেই জিনিসপত্র রাখতো তখনকার অভিনেতারা।'

'ওদের পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে কি করবো আমরা?' বিড়বিড় করলো মুসা। 'কিশোর···'

নীলামকারীর চিৎকারে তার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল, 'দেখুন, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, চেয়ে দেখুন। মোটেও নতুন নয়, আধুনিক নয়, হতেই পারে না। অ্যানটিক হিসেবে কি চমৎকার জিনিস, ভেবে দেখুন। চিন্তা করুন, এই রকম ট্রাংকে করে জিনিস বয়ে নিয়ে বেড়াতো আমাদের দাদারা। কি আছে এর ভেতরে?'

ডালার ওপর জোরে চাপড় দিলো সে। ভোঁতা শব্দ হলো।

'কি আছে কে জানে? কতো কিছুই থাকতে পারে। হয়তো কোনোরাশান দারের হীরার মালা আছে, সোনার মুকুটও থাকতে পারে। পারে না? পারে। তাহলে, কতো দাম হতে পারে এর? কতো? বলুন? যা খুশি বলুন?'

ক্রেতারা নিরব। পুরনো ট্রাংকটা কেউ কিনতে চায় না। হতাশ দেখালো নীলামকারীকে। এতো বক্তৃতা দিয়ে লাভ হলো না। 'বলুন, বলুন,' আবার চেঁচালো সে। 'নিশ্চিন্তে দাম বলুন। যা খুশি। পুরনো এতো সুন্দর একটা অ্যানটিক ট্রাংক, অতীত দিনের এতো সুন্দর···'

'এক ডলার!' এক পা সামনে বাড়লো কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'এক ডলার।' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো নীলামকারী। 'ইনটেলিজেন্ট ইয়াং ম্যান। এক ডলার হেঁকেছে। আর কারও কিছু বলার আছে? দিয়ে দিচ্ছি। এক ডলারেই দিয়ে দিচ্ছি। বলুন, কেউ কিছু বলুন। বলার আছে? নেই? বেশ, এক ডলার, এক···এক ডলার, দুই···এক ডলার, তিন। ব্যস, হয়ে গেল বিক্রি।' খটাস করে হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারলো সে।

হেসে উঠলো দর্শকরা। ওই ট্রাংক কেউ চায় না। নীলামকারীও দাম বাড়ানোর জন্যে চাপাচাপি করে সময় নষ্ট করেনি। জিনিসটা নেয়ার জন্যে এগোলো কিশোর। এতো কমে পেয়ে যাবে, সে-ও ভাবেনি, অনাকাঙ্ক্ষিতই হয়েছে।

ঠিক এই সময় পেছনের দর্শকদের মাঝে জোরালো গুঞ্জন উঠলো। দু'হাতে ঠেলে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে এক বৃদ্ধা। মাথায় একটা চুলও বাঁচা নেই, সব শাদা। পুরনো ধাঁচের একটা হ্যাট মাথায়, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে বললো মহিলা। 'আমি ডাকতে চাই। দশ ডলার। ট্রাংকটার জন্যে দশ ডলার দেবো।'

সব ক'টা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল তার দিকে। এতো বোকা কে আছে, পুরনো বাজিল একটা ট্রাংকের জন্যে দশ ডলার দিতে চায়?

'বিশ ডলার!' জবাব না পেয়ে ওপরে হাত নেড়ে আবার চেঁচিয়ে বললো মহিলা। 'বিশ ডলার দেবো।'

'সরি, ম্যাডাম,' জবাব দিলো নীলামকারী, 'বিক্রি হয়ে গেছে।

এই,' দুই সহকারীকে বললো সে, 'সরাও, এটা সরিয়ে নিয়ে যাও। অন্য জিনিস তোলো। অনেক বাকি এখনও।'

মঞ্চ থেকে ট্রাংকটা নামিয়ে কিশোরের দিকে এগোলো ওরা।

'এই যে, তোমার জিনিস।'

'কিনে তো বসলে,' মুসা বললো কিশোরকে, 'কি করবে এখন এটা দিয়ে?'

'বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুলবো,' একপাশের চামড়ার হাতল চেপে ধরলো কিশোর। 'ধরো, ওদিকেরটা। ওঠাও।'

'আরে রাখো রাখো,' বলে উঠলো নীলামকারীর এক সহকারী, 'আগে দাম দাও। এক ডলার,' হাত বাড়ালো সে।

'ও হ্যাঁ,' পকেট থেকে এক ডলার বের করে দিলো কিশোর।

খসখস করে রশিদ লিখলো লোকটা। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'যাও, এবার ওটা তোমার। দেখো হীরার মালাটালা পাও নাকি। হাহ্ হাহ্ হা!'

ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে চললো কিশোর আর মুসা। দর্শকদের ভিড়ের বাইরে বের করে এনে রাখলো।

ওদের প্রায় পেছনেই বেরোলো সেই শাদা-চুল বৃদ্ধা। 'এই ছেলেরা, শোনো। বিশ ডলারে আমি কিনতে চাই ওটা।...না না, ঠিক আছে, পঁচিশ ডলারই দেবো। পুরনো ট্রাংক সংগ্রহ করা আমার নেশা।'

'পঁচিশ ডলার!' ভুরু কোঁচকালো মুসা।

'দিয়ে দাও কিশোর,' রবিন বললো।

'ভালো লাভ, তাই না?' মহিলা বললো। 'আমি মজে কিনছি। আর কারো কাছে এটার কানাকড়ি দামও নেই। এই নাও, পঁচিশ ডলার।'

'সরি, ম্যাডাম,' মুসা, রবিন, এমনকি মহিলাকেও অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লো কিশোর। 'বেচবো না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাই।'

'কি আর থাকবে ওটার মধ্যে?' বললো মহিলা। 'দামী কিছুই নেই। এই নাও, তিরিশই দিচ্ছি, যাও।'

'সরি ম্যাডাম,' আগের মতোই মাথা নাড়লো কিশোর। 'সত্যিই বেচবো না।'

কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল বৃদ্ধা। সামনা চমকে উঠলো বলে মনে হলো। আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি ঘুরে ঢুকে গেল ভিড়ের মধ্যে। কি দেখে ভয় পেয়েছে, বোঝা গেল। ক্যামেরা হাতে এগিয়ে আসছে এক তরুণ।

'হাই ছেলেরা,' বললো লোকটা, 'আমি ক্যাল উইলিয়ামস, দা হলিউড নিউজের রিপোর্টার। "মানুষের আগ্রহ" নিয়ে একটা ফিচার করার ইচ্ছে। ট্রাংক হাতে তোমাদের একটা ছবি নিতে চাই। ধরে তুলবে প্লীজ!...হ্যাঁ হ্যাঁ, এভাবেই হবে,' রবিনের দিকে তাকালো। 'তুমিও গিয়ে দাঁড়াও না পেছনে। তোমার ছবিও উঠুক।'

কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালো ট্রাংকের পেছনে। চোখে পড়লো, ডালার ওপরে লাল রঙে

লেখা রয়েছে : দা গ্রেট ডেটলার। রঙ মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখাটা, কিন্তু পড়া যায়।

ঝিলিক দিয়ে উঠলো ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান, ছবি উঠে গেল ওদের।

'থ্যাংকস,' বললো রিপোর্টার। 'তা তোমাদের নাম জানতে পারি? তিরিশ ডলার কেন ফিরিয়ে দিয়েছো, কারণটা? ভালোই তো লাভ ছিলো।'

'জাস্ট কৌতূহল,' জবাব দিলো কিশোর। 'আর কিছু না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাই। কিনেছি কৌতূহল মেটাতে, সেটাই বড় লাভ।'

'রাশান জারের হীরার মালা আছে, সত্যি ভাবছো তাহলে?' হাসলো রিপোর্টার।

'ওটা কথার কথা বলেছে নীলামকারী।' মুসা বললো। 'ভেতরে পোকায় কাটা পুরনো কাপড় আছে হয়তো। ছালা-বস্তা থাকলেও অবাক হবো না।'

'তা ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় জানালো রিপোর্টার। 'নামটা দেখো। দা গ্রেট ডেটলার, কেমন নাটক নাটক গন্ধ আছে না? ও, তোমাদের নাম যেন কি বললে?'

'কিছুই বলিনি,' বলে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর। 'এই যে, আমাদের নাম।'

ভুরু ওপরে উঠলো লোকটার। 'গোয়েন্দা? এ-জন্যেই। ত্রিশ ডলার লাভ কেন ছেড়ে দিলে এতোক্ষণে বোঝা গেল।

যা-ই হোক, অনেক ধন্যবাদ। হয়তো আজ সন্ধ্যের কাগজেই ছবি দেখতে পাবে তোমাদের। অবশ্য, যদি গল্পটা সম্পাদকের পছন্দ হয়।'

হাত তুলে 'গুড-বাই' জানিয়ে ঘুরলো তরুণ রিপোর্টার।

ট্রাংকের একটা হাতল আবার ধরে কিশোর বললো, 'মুসা, ধরো। বেরিয়ে যাই।'

আগে আগে চললো রবিন। পেছনে ট্রাংক ধরাধরি করে অন্য দু'জন।

'ব্যাটাকে আমাদের নাম বললে কেন?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'বিজ্ঞাপন,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'যে কোনো ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞাপন অবশ্যই লাগবে। নইলে লোকে জানবে না।'

বড় একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে চত্বরে নামলো ওরা। তার পরে পথ। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাংকটা ট্রাকের পেছনে তুলে দিয়ে সামনে বোরিসের পাশে উঠে বসলো তিন গোয়েন্দা।

'বাড়ি যাবো,' বোরিসকে বললো কিশোর। 'একটা জিনিস কিনেছি। বাড়ি গিয়ে খুলবো। জলদি যান।'

'হোকে (ওকে),' এঞ্জিন স্টার্ট দিলো বোরিস। 'কি কিনেছো?'

'পুরনো একটা ট্রাংক,' জবাব দিলো মুসা। 'কিশোর, তালা খুলবে কিভাবে?'

'অনেক পুরনো চাবি আছে ইয়ার্ডে। আশা করি কোনো একটা লেগে যাবে।'

'যদি না লাগে?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'ভেঙ্গে খুলবে?'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'তাতে নষ্ট হবে সুন্দর জিনিসটা। অ্যানটিক ভ্যালু শেষ। চাবিটাবি দিয়েই খুলতে হবে কোনোমতে।'

সারা পথে আর একটা কথাও হলো না।

ইয়ার্ডে ঢুকলো ট্রাক।

ট্রাংকটা নামানো হলো।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'এটা কি?···ও, ট্রাংক। অনেক পুরনো তো। আনলি কোত্থেকে?'

'নীলাম ডেকে,' জানালো কিশোর। 'এক ডলার দিয়ে।'

'মাত্র? বলিস কি? তোর চাচা গেলে দশ ডলারের কম লাগাতো না। খুব ভালো করেছিস। ভেতরেও বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে। খুলবি কি দিয়ে? অফিসে পুরনো অনেক চাবি আছে। নিয়ে আয়গে চট করে।'

রবিনকে ইশারা করলো কিশোর। বললো, 'ডেস্কের ধারে দেয়ালে ঝোলানো, দেখো।'

চাবির গোছা নিয়ে এলো রবিন।

পুরো আধ ঘণ্টা চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিলো কিশোর। তালা খুলতে পারলো না।

'এবার?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'চাড় দিয়ে ভাঙবে?' রবিন বললো।

'না,' কিশোর বললো। 'চাচার কাছে আরও চাবি আছে। কোথায় রেখেছে কে জানে। চাচা আসুক।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন মেরিচাচী। আবার বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। 'কি রে, পারলি না? থাক, পরে খুলিস। খেয়ে নে গিয়ে। অনেক কাজ জমেছে। বোরিস একা কুলাতে পারছে না, তোরা একটু হাত লাগাস।'

ট্রাংক খোলা আপাতত বাদ দিয়ে খেতে চললো ছেলেরা।

খেয়ে এসে বোরিসকে কাজে সাহায্য করলো।

বিকেলে বড় ট্রাকটা নিয়ে ফিরলেন রাশেদ পাশা। ড্রাইভ করছে রোভার। ট্রাকের পেছনটা পুরনো মালপত্রে বোঝাই।

ট্রাক থেকে নেমে বিশাল গোঁফে তা দিতে দিতে এগোলেন রাশেদ পাশা। হাতে একটা খবরের কাগজ। ছেলেদের ওপর চোখ পড়তে ডেকে বললেন, 'এই এদিকে এসো তোমরা। কাগজের নিউজ হয়ে গেছো দেখি।'

হাঁকডাক শুনে অফিস থেকে মেরিচাচীও বেরোলেন।

ভেতরের পাতায় বেরিয়েছে খবরটা, দেখালেন রাশেদ পাশা। মুসা আর কিশোর ট্রাংক ধরে দাঁড়িয়েছে, পেছনে রবিন। স্পষ্ট ছবি। এমনকি বাক্সের ডালার লেখাটাও বোঝা যায়। হেডলাইন করেছে: রহস্যময় ট্রাংক—কৌতূহলী তিন কিশোর গোয়েন্দা। নিচের লেখাটা হালকা মেজাজের। ছেলেদের ধারণা, ভেতরে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেতে পারে, একথা লিখেছে। এক ডলারে

কিনে তিরিশ ডলারে যে বিক্রি করতে রাজি হয়নি, একথাও। জোরে জোরে পড়ে শোনালেন তিনি।

'বিজ্ঞাপন না ছাই,' গোমড়ামুখে বললো মুসা। 'আমাদেরকে ধাধা বানিয়ে ছেড়েছে। দামী জিনিসের লোভে যে ছাড়িনি আমরা, সেটাই বুঝিয়েছে।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'আর যদি সত্যি সত্যি কিছু পেয়ে যাই?'

'ছাগলটার মুখে চুনকালি পড়বে,' বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'ওই রিপোর্টারগুলোর কাজই এমনি। খালি লোকের খুঁত খুঁজে বেড়ায়। মন খারাপ করিস না। হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি খাওয়া বাড়ি। রবিন, মুসা, তোমরাও ধুয়ে এসো।'

হাত-মুখ ধু'লো মুসা আর রবিন, কিন্তু আর খেতে বসলো না। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মা-বাবা ভাববেন। সাইকেল নিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো ওরা।

ট্রাংকটা অফিসের কোণে রেখে খেতে চললো কিশোর।

ইয়ার্ডের গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

সন্ধ্যেটা কেটে গেল একভাবে, নতুন কিছু ঘটলো না। শোয়ার জন্যে উঠলো কিশোর। দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো।

বোরিস আর রোভার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

'কিশোর,' দরজা খুলতেই ফিসফিস করে বললো বোরিস, 'ইয়ার্ডে আলো দেখেছি। কে জানি আছে ওখানে। গিয়ে দেখা দরকার।'

'বলো কি?' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'চোরটোর কিছু হবে। দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি যাও।'

'এতো অস্থির হওয়ার কিছু নেই, মেরি,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। 'তুমি চুপ করে বসো এখানে। আমরা যাচ্ছি।

গেটের কাছাকাছি আলো দেখেছে দুই ভাই। পা টিপে টিপে এগোলো সেদিকে। ওদের পেছনে রইলো কিশোর।'

আবার আলো দেখা গেল। একটা জঞ্জালের স্তূপের ওপাশে। টর্চ জ্বেলেছে কেউ।

সেদিকে চেয়ে হাঁটতে গিয়ে কিসে হোঁচট খেয়ে ধুড়্‌স করে আছাড় খেলো রোভার। 'হাউফ!' করে উঠলো।

প্রায় সংগে সংগেই শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের শব্দ। স্তূপের ওধার থেকে বেরিয়ে এলো দুটো ছায়ামূর্তি। গেটের বাইরে বেরিয়ে একটা গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেল।

বোরিস, কিশোর আর রাশেদ পাশা দৌড়ে এলেন গেটের কাছে। পাল্লা খোলা। তালা ভাঙা। চোরেরা পালিয়েছে।

কি মনে হতে ঘুরে দৌড় দিলো কিশোর। ছুটে এসে ঢুকলো অফিসে। আলো জ্বেলেই স্থির হয়ে গেল যা সন্দেহ করেছিলো তা-ই ঘটেছে।

ট্রাংকটা নেই!

দুই

সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডের গেটের ভেতরে এসে ঢুকলো রবিন। উজ্জ্বল রোদ। গরমের চমৎকার এক সকাল। দিনটা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে।

মুসা আর কিশোর কাজে ব্যস্ত। পুরনো একটা ঘাস-কাটা মেশিনের মরচে ধরা গা ডলছে সিরিশ দিয়ে। মরচে তুলে পরিষ্কার করে তারপর রঙ করবে। পাশে পড়ে আছে লোহার কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার। ওগুলোও রঙ করতে হবে।

রবিনের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালো দু'জনে।

'এই যে, রবিন,' কিশোর বললো। 'এসো।'

সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে এগিয়ে এলো রবিন। 'ট্রাংকটা খুলেছো? ভেতরে কি আছে?'

'ট্রাংক?' মলিন দেখালো মুসার হাসি। 'কোন্ ট্রাংকের কথা বলছো?'

'আর কোনটা? কাল যেটা এনেছি,' অবাক মনে হলো

রবিনকে। 'পত্রিকায় মা-ও দেখেছে আমাদের ছবি। বললো ভালোই নাকি উঠেছে। ভেতরে কি আছে জানার জন্যে অস্থির। বলে দিয়েছে, ফোন করে যেন জানাই।'

'সবারই দেখি আগ্রহ,' জোরে জোরে সিরিশ দিয়ে মেশিনের গায়ে ডলা দিলো কিশোর। 'আশ্চর্য! ভুলই বোধহয় করেছি। বেচে দিলে পারতাম।'

'এখন দিলেই হয়।'

'আর দেয়া যাবে না,' বললো মুসা।

'মানে?'

'মানে দেয়া যাবে না। নেই তো বেচবে কি? কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে ট্রাংকটা।'

'চুরি! কে চুরি করলো?'

'জানি না,' জবাব দিলো কিশোর। সংক্ষেপে সব বললো রবিনকে।

'ওরা নিয়ে কি করবে?' শুনে বললো রবিন। 'ভেতরে এমন কি ছিলো?'

'হয়তো নিছক আগ্রহ,' মুসা বললো। 'কাগজে ফিচার পড়ে কৌতূহল হয়েছে। হয়তো ভেবেছে, ভেতরে কিছু থাকলেও থাকতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'শুধু কৌতূহলের কারণে ওই ট্রাংক চুরি করতে আসবে না কেউ। ঝুঁকি নেবে না। নিশ্চয় ভেতরে মূল্যবান কিছু আছে, এবং সেটা

জানে ওরা। আগে জানলে তালা ভেঙেই খুলে দেখতাম।'

ওদের আলোচনায় বাধা দিলো নীল একটা গাড়ি। ইয়ার্ডে ঢুকছে। গাড়ি থেকে নামলো লম্বা, পাতলা একজন লোক। ভুরু দুটো অদ্ভুত, দু'দিকের দুই কোণ উঠে গেছে কপালের দিকে—সিনেমায় ডাইনী কিংবা শয়তানের ভুরু যেরকম আঁকা হয় অনেকটা তেমনি।

'গুড মর্নিং,' কাছে এসে কিশোরের দিকে চেয়ে বললো লোকটা। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।'

'হ্যাঁ, স্যার। কিছু চাই?'

'চাই তো একটা জিনিসই। পুরনো ট্রাংকটা। কাগজে পড়লাম। এক ডলার দিয়ে কাল যেটা কিনে এনেছো। এনেছো না?'

'হ্যাঁ, স্যার,' লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো কিশোর, 'এনেছি।'

'বেশ। কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ওটা কিনতে চাই। বিক্রি করে ফেলোনি তো?'

'না, স্যার, কিন্তু···'

'তাহলে আর কি,' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিলো না লোকটা। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। হাতে বেরিয়ে এলো দশটা কড়কড়ে নোট, যেন ম্যাজিক। হাতপাখার মতো করে ওগুলো ধরে মুখে বাতাস করলো একবার। 'দেখো, একশো ডলার। দশটা দশ ডলারের নোট। ট্রাংকটার জন্যে।' কিশোর

কে দ্বিধা করতে দেখে তাড়াতাড়ি বললো, 'অনেক, তাই না? এক ডলারের একটা ট্রাংকের জন্যে আর কতো বেশি চাও? পুরনো ট্রাংক। ভেতরে আছেই বা কি? ঠিক না?'

'হ্যাঁ, স্যার, কিন্তু···'

'অতো কিন্তু কিন্তু করো না তো। ভালো দাম দিচ্ছি আমি। কাগজে লিখেছে ট্রাংকটার মালিক ছিলো দা গ্রেট ডেটলার। তাই না?'

'হ্যাঁ, ডালার ওপরে নামটা লেখা আছে বটে, কিন্তু···'

'আবার কিন্তু! "বাট মি নো বাটস!" অনেক আগেই শেকসপীয়ার বলেছেন একথা, এখন আমিও বলছি। আসলে কথা হলো কি জানো, দা গ্রেট ডেটলার আমার বন্ধু ছিলো। অনেক বছর তার সংগে দেখাসাক্ষাৎ নেই। মনে হয়, বেঁচেও নেই বেচারা। পুরনো বন্ধুর স্মৃতি হিসেবে রেখেদিতে চাই ট্রাংকটা।··· এই যে, আমার কার্ড।' বিশেষ ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকালো লোকটা। গায়েব হয়ে গেল নোটগুলো, তার জায়গায় দেখা গেল ছোট একটা শাদা কার্ড। বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে।

হাতে নিয়ে পড়লো কিশোর। হ্যামলিন দা মিসটিক। নিচে ম্যাজিশিয়ানদের একটা ক্লাবের নাম, তার নিচে হলিউডের ঠিকানা।

'আপনি যাদুকর?'

মাথা সামান্য নুইয়ে ম্যাজিশিয়ানদের কায়দায় বাউ করলো লোকটা। 'ছিলাম একসময়। সারা ইউরোপে যাদু দেখিয়েছি

আমি। এখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। ম্যাজিকের ইতিহাসের ওপর বই লিখছি একটা। মাঝে মাঝে এখনও যাদু দেখাই, তবে উৎসব অনুষ্ঠানে, বন্ধুরা দাওয়াত দিলে। ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি।'

আবার হাত ঝাঁকালো সে। নোটগুলো ফিরে এলো আঙুলে। 'বেচাকেনা শেষ করে ফেলা দরকার। এই নাও টাকা। ট্রাংকটা নিয়ে এসো। দ্বিধা করছো কেন?'

'কারণ ট্রাংকটা বিক্রি করতে পারছি না। সেকথাই এতোক্ষণ বলার চেষ্টা করেছি আপনাকে।'

'কেন?' তির্যক ভুরু কাছাকাছি হলো যাদুকরের। 'পারছো না কেন? নিশ্চয় পারবে। পারতেই হবে। দেখো ছেলে, আমাকে রাগিও না। ব্যবসা ছেড়েছি, কিন্তু বিদ্যা ভুলিনি। ধরো,' সামনের দিকে মুখ ঠেলে দিলো সে, চকচক করে উঠলো কালো চোখ, 'তুড়ি দিলাম, আর ফুসমন্তরে হাওয়া হয়ে গেলে তুমি। একেবারে গায়েব। কোনোদিন আর ফিরে আসবে না। খারাপ লাগবে না তখন?'

এতোই বাস্তব মনে হলো যাদুকরের কথা, ঢোক গিললো মুসা আর রবিন।

কিশোরের চেহারায়ও অস্বস্তি ফুটলো। 'নেই তো, বিক্রি করবো কিভাবে? কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি! সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।' সেই সকালে তৃতীয়বারের মতো একই গল্প বলতে হলো আবার কিশোরকে।

মন দিয়ে শুনলো যাদুকর। দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আহহা, দেরিই করে ফেললাম। সকালে কাগজে পড়েছি, পড়েই ছুটেছি। চোর ব্যাটাদের দেখেছো?'

'না। আমরা কাছে যাওয়ার আগেই পালিয়েছে।'

'খারাপ, খুব খারাপ,' বিড়বিড় করলো যাদুকর।' 'ট্রাংকটা এতোদিন পর যা-ও বা বেরোলো···তা চুরি করলো কেন?'

'হয়তো ভেতরে মূল্যবান কিছু ছিলো,' রবিন বললো।

'দূর! ডেটলারের ট্রাংকে দামী কিছু থাকতেই পারে না। টাকা ছিলো না ওর। তবে হ্যাঁ, যাদু দেখানোর ক্ষমতা ছিলো বটে। হয়তো, যাদুর কিছু কৌশল লেখা খাতা ছিলো ট্রাংকটায়। কিন্তু তাহলে তো শুধু অন্য কোনো ম্যাজিশিয়ানই আগ্রহী হবে, আমার মতো কেউ।

'দা গ্রেট ডেটলার যে যাদুকর ছিলো, বলেছি কি? না বললেও নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো। ছোট্টখাট্টো একজন মানুষ, রোগা-পাতলা গোল মুখ, কালো চুল। প্রায়ই এশিয়ান পোশাক পরতো, এশিয়ান যাদুকরদের ভাবভঙ্গি নকল করতে পছন্দ করতো। তার মতে এশিয়ান যাদুকররা নাকি খুব ভালো যাদু দেখাতে পারে। হয়তো ওদেরই কোনো কৌশল লেখা ছিলো ট্রাংকে···যাকগে, বলে আর লাভ কি? চুরিই তো হয়ে গেছে।'

নিরবে ভাবলো কিছুক্ষণ যাদুকর। হাত ঝাড়া দিতেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল নোটগুলো। হতাশ কণ্ঠে বললো, 'খামোকাই

এলাম। লাভ হলো না। আচ্ছা, এক কাজ তো করতে পারো। খুঁজে বের করতে পারো ওটা। তাহলে, মনে রেখো, হ্যামলিন দা মিসটিক ট্রাংক কিনতে আগ্রহী।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিশোরের ওপর নিবদ্ধ করলো যাদুকর। 'বুঝেছো, ইয়াং ম্যান! ট্রাংকটা আমি চাইছি। কার্ডের ঠিকানায় পাবে আমাকে।'

'ওই ট্রাংক আর পাওয়া যাবে না,' মুসা বললো।

'পাওয়া যেতেও পারে,' এমনভাবে বললো যাদুকর, যেন সে জানে পাওয়া যাবেই, যাদুর জোরে। 'এবং পাওয়া গেলে আমার কথা ভাববে প্রথমে। রাজি?'

'যদি পাওয়া যায়,' জবাব দিলো কিশোর, 'আপনাকে না জানিয়ে আর কারো কাছে বিক্রি করবো না, এই কথা দিতে পারি। কিন্তু কিভাবে পাবো আমিও বুঝতে পারছি না। এতো ক্ষণে চোরেরা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে।'

'হয়তো। দেখাই যাক না, কি ঘটে। কার্ডটা রেখো, ফেলো না।' পকেটে হাত ঢোকালো হ্যামলিন। অবাক হলো যেন। বের করে আনলো একটা ডিম। 'আরি, এটা এলো কোত্থেকে? এই, ধরো, ভেঙ্গে খেও।'

ছুঁড়ে দেয়া ডিমটা লুফে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো মুসা। কিন্তু পারলো না। মাঝপথেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, ঝিলিক দিয়ে।

'হুম্‌ম্‌,' পেশাদারী কায়দায় গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো যাদুকর, 'নিশ্চয় ডোডো পাখির ডিম ছিলো। ডোডোরা দুনিয়া

থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তো, তাদের কোনো চিহ্নই আর রাখতে চায় না। যাক, অনেকক্ষণ থাকলাম। চলি। আমার কথা ভুলো না।'

লম্বা লম্বা পায়ে গাড়ির কাছে হেঁটে গেল যাদুকর।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। আশা করলো, আবার কোনো একটা যাদু দেখাবে লোকটা।

নিরাশ হতে হলো তাদেরকে। আর কিছুই করলো না যাদুকর। গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

'বাপরে বাপ!' বলে উঠলো মুসা। 'কাস্টোমার বটে।'

'ব্যাটা সত্যি কথা বলেছে তো?' কিশোর বললো। 'বন্ধুর জিনিস বলে চায়, নাকি ট্রাংকের ভেতর আসলেই দামী কিছু আছে?'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় আবার গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো। ওরা ভাবলো, কোনো কারণে বুঝি হ্যামলিনই ফিরে এসেছে। কিন্তু না, আরেকটা গাড়ি, ছোট একটা স্যালুন। চত্বরে ঢুকে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে এলো এক তরুণ। দেখামাত্রই ওকে চিনলো ছেলেরা। সেই রিপোর্টার, ক্যাল উইলিয়ামস।

'এই যে ছেলেরা,' এগিয়ে আসছে রিপোর্টার, 'চিনতে পেরেছো তো!'

'হ্যাঁ,' ঘাড় কাত করলো কিশোর।

'এলাম, ট্রাংকে কি আছে জানতে। তাহলে আরেকটা ফিচার

লিখতে পারবো। ভেতরে স্পেশাল কিছু থাকতে পারে। কথা-বলা মড়ার খুলি বেরোলেও অবাক হবো না।'

তিন

'কথা-বলা মড়ার খুলি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হ্যাঁ। মানুষের খুলি। পেয়েছো নাকি?'

ট্রাংক চুরির গল্প সেদিন চতুর্থবার বলতে হলো কিশোরকে।

'হায় হায় সর্বনাশ! গেল আমার ফিচার। কে নিলো! খবরের কাগজে পড়েছে এমন কেউ?'

হতে পারে, কিশোর বললো। 'যে নিয়েছে সে হয়তো জানে খুলিটার কথা। সত্যিই কথা বলতো নাকি, মিস্টারউইলিয়ামস?'

'শুধু ক্যাল বলে ডাকলেই চলবে। কথা বলতো কিনা জানি না, আমি শিওর না। কাল ডেটলারের নামটা দেখার পর থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছি। মনে হলো, নামটা পরিচিত। শেষে মর্গের ভেতরে খুঁজতে শুরু করলাম···খবরের কাগজের মধ্যে কি জানো নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকালো তিনজনেই। জানে। পুরনো খবরের কাগজ, কাটিং, ছবি জমা করে রাখা হয় যে ঘরে সে-ঘরকে বলে খবরের

কাগজের মর্গ। একধরনের লাইব্রেরিও বলা যায় একে।

'মর্গে খুঁজতে শুরু করলাম,' বলে গেল উইলিয়ামস। 'পাওয়া গেল দা গ্রেট ডেটলার। অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে ওকে নিয়ে। খুব বড় যাদুকর ছিলো না যদিও, একটা বিশেষ যাদুর যন্ত্র ছিলো তার। একটা কথা-বলা খুলি।

'বছরখানেক আগে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল ডেটলার। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কেউ জানে না সে মরেছে না বেঁচে আছে। ট্রাংকটা ফেলে গেল এক হোটেলে। সেটাই কাল নীলাম ডেকে আনলে তোমরা। আমার মনে হয় যাদু দেখানোর জিনিস-পত্র ছিলো ওটার মধ্যে, সেই খুলিটাও। ভালো ফিচার হতে পারতো।'

'ডেটলার নিখোঁজ,' রবিন বললো, 'মানে একজন যাদুকর নিখোঁজ!'

'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময়,' কিশোর বললো। 'যাদুকর নিখোঁজ, একটা কথা বলা খুলি নিখোঁজ, এখন ট্রাংকটাও নিখোঁজ...'

'এক মিনিট, এক মিনিট,' হাত তুলে বাধা দিলো মুসা। 'তোমার কথাবার্তা ভালো ঠেকছে না আমার, কিশোর। তদন্ত করার কথা ভাবতে শুরু করেছো মনে হয়। তা করতে পারো, কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। যাদুকরের মড়ার খুলি, তা-ও আবার নিখোঁজ...না বাপু, আমি এসবে নেই আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তদন্ত করবো কি? ট্রাংকটাই তো নেই। তবে, গ্রেট ডেট-

লারের ব্যাপারে জানতে আমি আগ্রহী। ক্যাল, বলবেন?'

'নিশ্চয়,' রঙছাড়া একটা লোহার চেয়ারে বসে পড়লো রিপোর্টার। 'খুলেই বলি। যাদুকর ছিলো গ্রেট ডেটলার, ছোট যাদুকর। তবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো তার কথা-বলা খুলি। কাচের একটা টেবিলে বসানো থাকতো। ধারেকাছে আর কোনো জিনিস থাকতো না। যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতো খুলিটা।'

'ভেনট্রিলোকুইজম?' অনুমান করলো কিশোর। 'হয়তো ঠোঁট না নেড়ে কথা বলা রপ্ত করেছিলো ডেটলার, সেই কথা ছুঁড়ে দিতো খুলিটার মুখ দিয়ে।'

'কি জানি। খুলিটা যখন কথা বলতো, তখন নাকি ঘরের মধ্যে দূরে বসে থাকতো ডেটলার। মাঝে মাঝে বাইরেও বেরিয়ে যেতো। চালাকিটা অন্য যাদুকরেরাও নাকি ধরতে পারেনি। তবে খুলিটা নিয়ে পুলিশী গোলমালে জড়িয়েছিলো ডেটলার।'

'সেটা কিভাবে?' রবিন জানতে চাইলো।

'যাদুকর হিসেবে সুবিধে করতে পারেনি ডেটলার। শেষে নতুন ব্যবসা ধরলো, লোকের ভাগ্য বলা, আই মীন, ভবিষ্যৎ বলা। কাজটা বেআইনী। এশিয়ান মহারাজাদের মতো আলখেল্লা পরে ছোট একটা সাজানো ঘরে বসতো। লোকে আসতো খুলির মুখ থেকে তাদের ভাগ্য শুনতে। অবশ্যই টাকার বিনিময়ে। খুলিটার একটা নামও রেখেছিলো ডেটলার, সক্রেটিস—একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতের নাম।'

'খুলিটা প্রশ্নের জবাব দিতো?' আবার জিজ্ঞেস করলো

ববিন।

'তাই তো শোনা যায়। ভবিষ্যদ্বাণী তো করতোই, নানারকম পরামর্শও নাকি দিতো খুলিটা। মার্কেট কেমন হবে না হবে, সে-কথাও নাকি বলেছিলো কয়েকজনকে। খুলির পরামর্শ মতো টাকা খাটিয়ে গচ্চা দিলো কিছু লোক, পুলিশকে গিয়ে জানালো। পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পাঠালো ডেটলারকে।

'বছরখানেক জেল খাটলো সে। বেরিয়ে এসে যাদু দেখানো, জ্যোতিষগিরি সব ছেড়েছুড়ে দিলো। কেরাণীর চাকরি নিলো। তারপর একদিন···হাওয়া! কেউ কেউ বলে, বড় অপরাধীদের চোখ পড়েছিলো তার ওপর। সক্রেটিসের সাহায্যে কোনো বে-আইনী কাজ করতে বলেছিলো। তাদের কথায় রাজি হয়নি ডেটলার। ভয়ে শেষে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'কিন্তু ট্রাংকটা সংগে নিয়ে যায়নি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কিংবা হয়তো কিছু ঘটেছে তার। সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।'

'ভালো কথা বলেছো,' একমত হলো উইলিয়ামস। 'হতেও পারে। হয়তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট···বিকৃত করে ফেলা হয়েছিলো তার দেহ, কেউ আর শনাক্ত করতে পারেনি।'

'হ্যামলিন কেন ট্রাংকটার জন্যে পাগল হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি,' মুসা বললো। 'খুলিটার লোভে। হতে পারে, সে-ই সরিয়ে দিয়েছে ডেটলারকে, যাতে খুলিটা হাতাতে পারে। ডেটলার জীবিত থাকতে সেটা সে পাচ্ছিলো না।'

'হ্যামলিন?' ভুরু কোঁচকালো উইলিয়ামস।

'হ্যাঁ,' হ্যামলিন যে এসেছিলো, জানালো কিশোর।

'কিনতে যখন এসেছিলো, তার মানে সে চোর নয়,' শুনে বললো উইলিয়ামস। 'যাকগে, যে খুশি চুরি করুক, সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি চাইছিলাম, সক্রেটিসকে নিয়ে ভালো একটা স্টোরি করবো। হলো না, কি আর করা। যাই। তোমাদের সংগে কথা বলে ভালো লাগলো।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ক্যাল উইলিয়ামস।

'উহু,' দুঃখ করে বললো কিশোর, 'ট্রাংকটা চুরি হয়ে গেল। নইলে বেশ ভালো একটা কেস হাতে পেতাম। কথা-বলা খুলির তদন্ত···দারুণ ইনটারেসটিং।'

'আমি মোটেও ইনটারেসটেড নই,' হাত নাড়লো মুসা। 'ট্রাংকটা গেছে, ভালো হয়েছে, আপদ বিদায়। কিন্তু খুলি আবার কথা বলে কিভাবে?'

'সেটাই তো জানার ইচ্ছে। ট্রাংকটা নেই, ভেবে আর কি হবে···ওই যে, চাচা ফিরেছে।'

ইয়ার্ডে ঢুকলো বড় ট্রাকটা। পুরনো মালপত্রে বোঝাই। কেবিনের পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'কি ব্যাপার? খুব খাটুনি?··· কই, কাজ তো কিছুই এগোয়নি। চিন্তা করছো মনে হয়?'

'চাচা,' কিশোর বললো, 'ট্রাংকটার কথা ভাবছি। গত কাল যেটা কিনে এনেছিলাম, রাতে চুরি গেছে। যাদুকরের ট্রাংক।'

'ও,' হাসলেন রাশেদ পাশা। 'এখনও বেরোয়নি তাহলে?'

'না। আর কোনোদিন বেরোবে বলেও মনে হয় না।'

'আমার অন্যরকম ধারণা। যাদুকরের ট্রাংক তো, হয়তো, যাদু করলেই ফেরত আসবে।'

হাঁ হয়ে গেল ছেলেরা।

'বলো কি, চাচা? কি যাদু করলে ফেরত আসবে?'

'এরকম,' চেহারাটাকে রহস্যময় করে তুললেন রাশেদ পাশা। সারকাসের বাজিকরের মতো তিড়িং করে এক ডিগবাজি খেলেন। তুড়ি দিলেন তিনবার। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করলেন, 'ছাগলের মাথা পাগলের মাথা, ট্রাংকের মাথা মানুষের মাথা? ছুহ্! ছুহ্! লাগ ভেল্কি লাগ, লাগ জোরে লাগ, ফিরে আয় যাদুকরের ট্রাংক?'

চোখ খুললেন? 'যাও, দিলাম মন্ত্র চালিয়ে। এতো জোরালো মন্ত্রেও কাজ না হলে বুদ্ধি খরচ করবো আমরা?'

'বুদ্ধি?' রীতিমতো অবাক হয়েছে কিশোর। তার চাচা হাসিখুশি মানুষ, হাসতে ভালোবাসেন, হাসাতে ভালোবাসেন! মজা করছেন না তো তাদের সংগে?

'কিশোর,' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল রাশেদ পাশার মুখ থেকে, 'তুমি গোয়েন্দা। গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ মাথা খাটানো। সেটা করছো না কেন?'

'কে বললো করছি না? তাই তো করছি?'

'না, করোনি? এখন বলো তো, গতরাতে কি কি ঘটে-

ছিলো?'

বিস্ময় আরও বেড়েছে কিশোরের। চাচা কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, বুঝতে পারছে না। 'ঘর থেকে বেরোলাম। রোভার আছাড় খেয়ে শব্দ করে ফেললো। দু'জন লোক ছুটে গেল গেটের দিকে, গাড়িতে করে পালালো। এই তো। তারপর অফিসে ঢুকে ট্রাংকটা আগের জায়গায় দেখলাম না?'

'তার মানেই কি চুরি হয়ে গেল?'

'নিশ্চয়ই? ওরা গেটের তালা ভেঙে ঢুকলো···এক মিনিট!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর? উত্তেজনায় রক্ত জমলো মুখে 'আমরা যখন বেরোলাম, তখনও ইয়ার্ডের ভেতরে ছিলো ওরা! টর্চ জ্বেলে খুঁজছিলো। রোভার চমকে দেয়ায় পালালো। দৌড়ে গিয়ে উঠলো গাড়িতে। কিন্তু তাদের হাতে ট্রাংক ছিলো না! তাহলে? গেল কোথায় ওটা? আগেই গাড়িতে তুলেছিল? না-তাহলে ইয়ার্ডে আর ঘোরাফেরা করতো না। তারমানে? ওরা আসার আগেই কেউ সরিয়ে ফেলেছিলো ট্রাংকটা?'

হাসলেন রাশেদ পাশা? 'ঠিকই বলেছো?'

'কে সরালো? যেতে যাওয়ার আগে আমি নিজে ওটা অফিসে রেখে গেছি?'

'ভাবো, কে সরালো,' মিটিমিটি হাসছেন রাশেদ পাশা।

'তু-তুমি···'

'হ্যাঁ, আমি। গেটে তালা দিয়ে এসে অফিসে উঁকি দিয়ে দেখি ট্রাংকটা। ভাবলাম, লুকিয়ে রাখি। দেখি সকালে উঠে না

পেলে কি করো তুমি। চোরেরা আমার মজাটাই নষ্ট করলো।'

'আপনি লুকিয়েছেন?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ভাবো। ভেবে বের করো। তোমরা তো গোয়েন্দা। এই ইয়ার্ডে ওরকম একটা ট্রাংক কোথায় লুকালে সহজে কারো চোখে পড়বে না?'

চাচার কথায় কান নেই, ইতিমধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে কিশোর। তক্তার স্তূপ, পুরনো যন্ত্রপাতি···না, ওসব জায়গায় না। বেড়ার ধার ঘেঁষে, ছয় ফুট চওড়া চালার ওপরে এক জায়গায় অনেকগুলো ট্রাংক রাখা আছে, পড়ে আছে অনেক দিন ধরে। সেদিকে নজর দিলো সে। বলে উঠলো, 'মুসা, রবিন, এসো সাহায্য করো আমাকে।'

এক এক করে ট্রাংকগুলো নামাতে শুরু করলো ওরা।

পাঁচ নম্বর ট্রাংকটার ওজন অন্য চারটের চেয়ে ভারি মনে হলো। কিশোর বললো, 'রাখতো, দেখি।'

ট্রাংকটা খুললো সে।

বাহ্, চমৎকার! ওই তো। যাদুকরের ট্রাংক। ডালার ওপরে লেখা: দা গ্রেট ডেটলার।

চার

'এবার দেখা যাক, এই চাবি দিয়ে খোলা যায় কিনা,' বললো কিশোর। চাচার কাছ থেকে পুরনো চাবির গোছা চেয়ে নিয়েছে।

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে এখন ওরা। ট্রাংকটা নিয়ে এসেছে এখানে, যাতে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে, আর কারও চোখে পড়ে না যায়। খরিদ্দার আসছে যাচ্ছে, কার কি উদ্দেশ্য কে জানে?

ট্রাংকটা পেয়েও মুখ কালো করে রেখেছে কিশোর। ভালো লজ্জা দিয়েছে আজ তাকে চাচা। একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে। দুই সহকারী বন্ধু—যারা ভাবে কিশোর পাশার অসাধ্য কিছু নেই, তাদের কাছে ছোট হয়ে গেছে মুখ। রাতে না হয় উত্তেজনার বশে খেয়াল করেনি, সকালে তো করা উচিত ছিলো।

'কানটা ধরে মুচড়ে দিয়েছে আজ আমার, চাচা,' গোমড়া-মুখে বললো সে।

সান্ত্বনা দিলো তাকে মুসা, 'ওসব ভেবে মন খারাপ করো

না...'

'...মানুষের ওরকম ভুল হয়েই থাকে,' বাক্যটা শেষ করলো রবিন। 'কিন্তু এখন কি করবে? হ্যামলিনকে কথা দিয়েছো, ট্রাংকটা পেলে তাকে খবর দেবে।'

'বলেছি তাকে না জানিয়ে অন্য কারো কাছে বিক্রি করবো না। বিক্রি করার কথা আপাতত ভাবছি না, অন্তত এই মুহূর্তে নয়।'

'আমি বলছি বেচেই দাও,' পরামর্শ দিলো রবিন। 'এক ডলারে কিনে নিরানব্বই ডলার লাভ, কম হলো?'

কিন্তু একটা কথা-বলা মড়ার খুলির স্বপ্ন দেখছে এখন কিশোর, টাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। 'বেচার কথা পরে ভাবা যাবে। দেখিই না খুলিটা আছে কিনা। কথা বলে কিনা।'

'সেটাই তো আমার ভয়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

জবাব দিলো না কিশোর। তালায় একের পর এক চাবি ঢুকিয়ে গেল। অবশেষে লাগলো একটা চাবি। জোরে মোচড় দিতেই খুলে গেল পুরনো তালা।

ডালা তোলা হলো।

ঝুঁকে এলো তিনজনেই। ভেতরে লাল সিল্কের কাপড়ের ঢাকনা। ওটা সরাতেই বেরোলো ট্রাংকের ওপরের অংশের ট্রে। তাতে ছোট ছোট কিছু জিনিস নানা রঙের কাপড় দিয়ে সুন্দর করে পুঁটুলি বাঁধা রয়েছে। এছাড়াও আছে একটা কোলাপসিবল পাখির খাঁচা, স্ট্যাণ্ডসহ একটা কাচের বল, কয়েক বাণ্ডিল তাশ,

কিছু ধাতব বাটি—ছোট-বড়, একটার মধ্যে আরেকটা সুন্দরভাবে বসে যায়। তবে পুঁটুলি দেখে মনে হলো না তার মধ্যে খুলি থাকতে পারে।

'ডেটলারের যাদু দেখানোর জিনিসপত্র,' বললো কিশোর। 'দেখি, তলায় থাকতে পারে ওটা।'

সে আর মুসা দু'দিক থেকে ধরে টেনে তুলে সরিয়ে রাখলো ট্রে-টা। নিচে বেশির ভাগই কাপড়-চোপড়, যদিও সাধারণ পোশাক নয়। একটা করে টেনে তুলতে লাগলো কিশোর। কয়েকটা সিল্কের জ্যাকেট, সোনালি রঙের একটা আলখেল্লা, একটা পাগড়ি, আর কিছু এশিয়ান যাদুকরদের পোশাক।

যা খুঁজছিলো, রবিন আগে দেখতে পেলো ওটা।

'ওই যে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'ওই লাল কাপড়টার মধ্যে।'

'ঠিক,' বলে জিনিসটা তুলে কাপড়ের মোড়ক খুললো কিশোর।

ঝকঝকে শাদা একটা খুলি। শূন্য কোটর যেন চেয়ে আছে কিশোরের দিকে। দাঁতের ভঙ্গি বিকট মনে হলো না, বরং কেমন যেন হাসিখুশি।

'সক্রেটিস,' রবিন বললো। 'কোনো সন্দেহ নেই।'

'তলায় আরও যেন কি আছে।' খুলিটা রবিনের হাতে দিয়ে ট্রাংক থেকে আরেকটা পুঁটুলি তুলে আনলো কিশোর। বেরোলো হাতির দাঁতে তৈরি একটা চাকতি, দুই ইঞ্চি পুরু। এক পিঠে খাঁজ কাটা—তার ওপর পাতলা স্পঞ্জ লাগানো।

'মনে হচ্ছে সক্রেটিসের স্যাণ্ড,' দেখতে দেখতে বললো কিশোর।

কাছেই একটা টেবিল। তাতে স্ট্যাণ্ডটা রাখলো সে। ঠিকই বলেছে। খাঁজের মধ্যে বসে গেল খুলির নিচের দিকটা। তিন-জনের দিকেই চেয়ে যেন হাসছে।

'খাইছে!' এই হাসি ভালো লাগছে না মুসার। 'কথা না শুরু করে আবার। আগেই বলে দিচ্ছি, আমি এসবের মধ্যে নেই।'

'মনে হচ্ছে ডেটলারই শুধু ওকে কথা বলাতে পারতো,' মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। 'খুলির ভেতরে কোনো কারসাজি নেই তো?'

খুলির ভেতরটা ভালোমতো দেখলো সে। কিচ্ছু নেই। 'নাহ্,' বিড়বিড় করলো। 'নেই কিছু।' আবার স্ট্যাণ্ডে রেখে দিলো ওটা।

'সক্রেটিস,' অনুরোধ করলো কিশোর, 'কথা বলো না কিছু, শুনি।'

নিরব রইলো খুলিটা।

'হুঁ, কথা বলার মুডে নেই। দেখি তো, আর কি আছে ট্রাংকে?'

তিনজনে মিলে বের করতে লাগলো জিনিসগুলো। নানা-রকম পোশাকের মাঝে একটা যাদুদণ্ড, আর কয়েকটা ছোট তলোয়ার পাওয়া গেল।

হঠাৎ পেছনে হ্যাচ্‌চো করে উঠলো কে যেন।

পাঁই করে ঘুরলো তিনজনে।

কই, কেউ তো নেই। শুধু খুলিটা।

তাহলে কি সক্রেটিসই হাঁচি দিলো?

পাঁচ

চোখ গোল গোল করে একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

'ও হাঁচি দিলো!' মুসা বললো। 'হাঁচি দেয়া আর কথা বলা একই কথা। এরপর হয়তো কবিতা পড়তে শুরু করবে।'

'হুমম্।' ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'রবিন, শিওর, তুমি দাওনি?'

'আরে না না। আমার পেছনে শুনলাম হাঁচি।'

'অদ্ভুত। কিছু একটা কৌশল করে রেখেছে ডেটলার। বুঝতে পারছি না।' আবার খুলিটা তুলে নিলো কিশোর। আরেকবার উল্টে পাল্টে দেখলো। রোদের মধ্যে এনে গর্তগুলোর ভেতরে দেখলো। 'নাহ্। কোনো যন্ত্রপাতি ভরে রাখার চিহ্ন নেই। একটা তারের মাথাও না। রহস্য বটে।'

'বটে কি বলছো? রহস্যের বাপ,' বললো মুসা।

'কিন্তু খুলিটা হাঁচলো কেন? রবিনের প্রশ্ন। 'কোনো কারণ

নেই। খুলির ঠাণ্ডা লাগতে পারে না।'

'কেন, জানি না,' কিশোর বললো। 'তবে চমৎকার একটা রহস্য যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চুটকিয়ে মাথা খাটানো যাবে।'

'খাটাও তোমার যতো খুশি,' হাত নাড়লো মুসা। 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কাল রাতে দুই চোর এলো ট্রাংক চুরি করতে। আজ ওটার ভেতর থেকে বেরোলো একটা খুলি, হাঁচি মারে। তারপর হয়তো...'

মেরিচাচীর ডাকে তার কথায় বাধা পড়লো।

'কিশোর? কোথায় তোরা? এই। কিশোর? বেরিয়ে আয় না।'

'সেরেছে,' বললো রবিন। 'এতো ডাকাডাকি? নিশ্চয় কাজ।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা। 'খাবার কথা হলে বলতো। চলো, ডাকছে যখন, না গিয়ে উপায় কি?'

'হ্যাঁ।' দ্রুতহাতে আবার সক্রেটিসকে ট্রাংকে ভরে তালা লাগিয়ে দিলো কিশোর।

তিনজনে বেরিয়ে এলো ওয়ার্কশপের বাইরে।

'এই যে, আয় একটু,' মোলায়েম গলায় বললেন মেরিচাচী। 'তোর চাচা গেছে আরও মাল আনতে। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে গেছে। এগুলো না গোছালেই নয়,' সকালের আনা মালের স্তূপ দেখালেন তিনি। 'আবার এনে রাখবে কোথায়? যে না একটু গুছিয়ে, লক্ষ্মী বাবারা আমার। খাওয়াবো।'

এই অনুরোধের পর আর না বলা যায় না।

কাজে লাগলো ওরা। মেরিচাচী বলেছেন বটে 'একটু,' কিন্তু কাজ অনেক বেশি। গোছাতে গোছাতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। সময় মতোই খাবার দিয়ে গেলেন তিনি। খেয়ে আবার কাজে লাগলো ওরা। প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় ট্রাক নিয়ে ফিরে এলেন রাশেদ পাশা। আরেক ট্রাক বোঝাই করে এনেছেন।

সারাটা বিকেলও ব্যস্ত থাকতে হলো ওদের। কাজ করছে বটে, কিন্তু কিশোরের মন পড়ে রয়েছে ট্রাংকের ভেতর।

কাজ শেষ করতে করতে সন্ধ্যা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো রবিন আর মুসা। মুসা বললো, পর দিন সকালে উঠেই চলে আসবে। রবিন জানালো, তার আসতে দেরি হবে। লাইব্রেরিতে যেতে হবে, চাকরি।

রাতের খাওয়া খেয়েই ঘুম পেলো কিশোরের। সারাদিনের খাটুনি, প্রচণ্ড ক্লান্তি, ভাবার মতো মন নেই আর এখন। উঠলো। ঘুমোতে যাওয়ার আগে খুলিটা সরিয়ে রাখবে। বলা যায় না, গতরাতে যখন এসেছিলো, আজও আসতে পারে চোর।

বাইরের চত্বর পেরিয়ে ওয়ার্কশপে এসে ঢুকলো কিশোর। তালা খুলে খুলি আর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা বের করে নিলো। ট্রাংকের সমস্ত জিনিসগুলো আবার ভরে রেখে তালা লাগিয়ে দিলো। ট্রাংকটা লুকিয়ে রাখলো ছাপার মেশিনটার ওধারে, ওপরে কয়েকটা ক্যানভাস চাপা দিয়ে দিলো। ট্রাংক এখানেই

থাক, কিন্তু খুলির ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

খুলি হাতে বসার ঘরে এসে ঢুকলো কিশোর। এঘর দিয়েই তার ঘরে যেতে হয়।

আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'ওটা কি রে, কিশোর? ওই মড়ার খুলি নিয়ে এসেছিস কোত্থেকে?'

'ও সক্রেটিস,' বললো কিশোর। যেন এতেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, বুঝে যাবেন মেরিচাচী। 'ভাবলাম, রাতে কথা বলতে পারে, তাই নিয়ে এলাম।'

'কথা বলবে?' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন রাশেদ পাশা। 'কি বলবে? দেখতে বুদ্ধিমানই লাগছে। গোয়েন্দা নাকি?'

'না, যাদুকর।'

'কোত্থেকে কি সব নিয়ে আসে।' বিড়বিড় করলেন মেরিচাচী। 'এই, তুই যা তো, সরা ওটা আমার চোখের সামনে থেকে। রান্তায় ফেলে দে গিয়ে।'

ফেলার ছেলে প্রশ্নই ওঠে না। শোবার ঘরে এনে সযত্নে দেরাজের ওপর রেখে দিলো কিশোর। খাওয়ার পর ঘুম আসছিলো বটে, এখন চলে গেছে। কাজও কিছু নেই। নিচে নেমে এলো আবার টেলিভেশন দেখার জন্যে।

তা-ও বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না। আবার উঠে এলো শোয়ার ঘরে। চুপচাপ বসে সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। না, কথা বলবে বলে মনে হয় না।

বোঝা যাচ্ছে, ডেটলার সামনে না থাকলে বলে না। তারমানে ভেনট্রিলোকুইজমই। অসাধারণ ক্ষমতাশালী ভেনট্রিলোকুইস্ট ছিল ডেটলার।

বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিলো কিশোর।

সবে তন্দ্রা লেগেছে, টুটে গেল মোলায়েম শিসের শব্দে।

আবার শোনা গেল শিস। মনে হলো ঘরের ভেতরেই।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল কিশোর। উঠে বসলো বিছানায়।

'কে? চাচা?' জিজ্ঞেস করলো। ভাবলো, বুঝি আবার কোনো মজা করতে এসেছেন।

'আমি,' দেরাজের দিক থেকে ভেসে এলো মোলায়েম স্বর, 'সক্রেটিস।'

'সক্রেটিস?' ঢোক গিললো কিশোর।

'সময় এসেছে···কথা বলার। না না···বাতি জ্বেলো না। শোনো···ভয় পেও না। শুনছো?···বুঝতে পারছো?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

অন্ধকারে খুলিটা দেখার চেষ্টা করলো কিশোর। দেখা গেল না। আরেকবার ঢোক গিলে বললো, 'হ্যাঁ, শুনছি।'

'গুড। নিশ্চয় যাবে···কাল···তিনশো এগারো নম্বর কিং স্ট্রীটে। কোড ওয়ার্ড···সক্রেটিস। বুঝতে···পারছো?'

'পারছি।' সাহস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কিন্তু কেন? কে কথা বলছো?'

'আমি···সক্রেটিস।' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ফিসফিসে মোলায়েম স্বর।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলো কিশোর। আগের মতোই বসে আছে সক্রেটিস, তার দিকে চেয়ে। হাসছে নিরব হাসি।

খুলিটা কথা বলেনি। বলতে পারে না। কিন্তু কিশোর নিশ্চিত এ-ঘর থেকেই কথা শোনা গেছে। জানালার বাইরে থেকে নয়।

জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিলো সে।

শান্ত, নির্জন চত্বর।

তাজ্জব কাণ্ড!

আবার বিছানায় ফিরে এলো কিশোর।

একটা মেসেজ দেয়া হয়েছে তাকে। আগামী দিন তিনশো এগারো নম্বর কিং স্ট্রীটে যাওয়ার অনুরোধ। মানে কি?—প্রশ্ন করলো নিজেকেই।

নিশ্চয়। রহস্য আরও জমে উঠছে, জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, এই তো চাই।

ছয়

'আমার যাওয়া লাগবে না?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটার সামনের সিটে পাশাপাশি বসে আছে সে আর কিশোর। ড্রাইভিং সীটে বোরিস।

তিনশো এগারো নম্বর বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। পুরনো, বড় অট্টালিকা। বারান্দার সামনে সাইনবোর্ড, রঙ-চটা, মলিন। শুধু 'রুমস' শব্দটা পড়া যায়। নিচে একটা 'নো ভ্যাকানসিজ' নোটিশ।

আশপাশের বাড়িগুলোরও একই দশা। জীর্ণ বিবর্ণ, বয়েসের ভারে ধুঁকছে। আরও বোর্ডিং হাউস আছে, স্টোর আছে কয়েকটা, সবগুলোরই মেরামত দরকার। রাস্তায় কয়েকজনকে দেখা গেল, সবাই বৃদ্ধ। বোঝা যায়, দরিদ্র কিংবা কম-আয়ের বুড়োদের এলাকা এটা।

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'বসে থাকো এখানে। ভয়

নেই, আমার কোনো বিপদ হবে না।'

'তুমিও না গেলে পারতে,' ভয়ে ভয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো মুসা। 'খুলি বললো আসতে, আর অমনি হুট করে চলে আসাটা উচিত হয়নি। অন্ধকারে বলেছে বললে না?'

'কি জানি, সত্যিই বলেছে কিনা। এমনও তো হতে পারে, স্বপ্ন দেখেছি আমি। কিন্তু স্বপ্নই হোক আর সত্যিই হোক, ঠিকানা মতো বাড়িটা তো পেয়েছি। আর পেয়েছি যখন, ভেতরে না ঢুকে আমি যাচ্ছি না। বিশ মিনিটের মধ্যে আমি ফিরে না এলে তুমি আর বোরিস ঢুকবে।'

'বেশ। কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না। এই কেসের কিছু কিছু জিনিস একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'ঠিক আছে। যদি কোনো বিপদে পড়ি, গলা ফাটিয়ে চিল্লাবো।'

'তাই করো,' বললো বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। 'যাও, কোন্ ব্যাটা কি করবে? আমি আছি না।' ঘুসি পাকিয়ে দেখালো সে।

'থ্যাংকিউ,' বলে ট্রাক থেকে নামলো কিশোর।

পথ পেরিয়ে সামনের ছোট বারান্দায় উঠলো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো একটা দরজার কাছে। কলিং বেলের বোতাম টিপলো।

তার মনে হলো, দীর্ঘ এক যুগ পরে যেন পায়ের আওয়াজ শোনা গেল ভেতরে।

বিশ্বাস

খুলে গেল দরজা। কালো চামড়ার একজন ছোট্টখাটো লোক। পুরু গোঁফ। 'কি চাই? রুম? নেই। সব ভর্তি।'

লোকটার কথায় বিদেশী টান। কোন দেশী, বুঝতে পারলো না কিশোর। চেহারায় বোকা বোকা ভাব ফুটিয়ে তুলে বললো, 'মিস্টার সক্রেটিসকে খুঁজতে এসেছি।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা। তারপর পিছিয়ে গেল। 'এসো। দেখি আছে নাকি।'

ঘরের ভেতরে পা রাখলো কিশোর। চোখ মিটমিট করলো মৃদু আলোয়। ছোট, ধুলায় ধূসর একটা হলঘর। তার ওধারে আরেকটা বড় ছড়ানো ঘর। অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। কয়েকজন লোক, কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ তাশ খেলছে। সবারই কালো চামড়া, কুচকুচে কালো চুল, পেশীবহুল শরীর। সবাই মুখ তুলে দেখলো কিশোরকে, কারও চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না।

তাকে দাঁড়াতে বলে চলে গেল, যে দরজা খুলেছিলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, 'এসো, শেরিনা দেখা করবে তোমার সাথে।'

পথ দেখিয়ে কিশোরকে আরেকটা ঘরে নিয়ে এলো লোকটা। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রোদে আলোকিত ঘর। আবছা অন্ধকার থেকে এসে প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না কিশোরের। আলো চোখে সয়ে আসার পর দেখলো মহিলাকে, বড় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে।

সেলাই করছিলো কি যেন। সেলাই থামিয়ে পুরনো ডিজাইনের চশমার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি শেরিনা, জিপসি,' বললো বৃদ্ধা, নরম, নীরস কণ্ঠ। 'কি চাই? হাত দেখাবে?'

'না, ম্যা'ম,' বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। 'মিস্টার সক্রেটিস আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

'ও, মিস্টার সক্রেটিস। কিন্তু মিস্টার সক্রেটিস তো মৃত।'

খুলিটার কথা ভাবলো কিশোর। ভুল বলেনি বৃদ্ধা, সক্রেটিস সত্যি মৃত।

'এবং তার পরেও তোমার সংগে কথা বললো,' বিড়বিড় করলো মহিলা। 'অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত। বসো, ইয়াং ম্যান। ওই যে টেবিলটার ধারে। কাচের বলের মধ্যে দেখতে হবে আমাকে।'

হাতির দাঁতের অলংকরণ করা, দামী কাঠের তৈরি ছোট একটা টেবিলের কাছে বসলো কিশোর।

উঠে এসে উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসলো শেরিনা। বিচিত্র ডিজাইনে তৈরি টেবিলের নিচের খোপ থেকে বের করলো ছোট একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে বেরোলো বড় একটা কাচের বল। টেবিলের মাঝখানে রাখলো বলটা।

'চুপ!' চুপ করেই আছে কিশোর, তা-ও' হিসিয়ে উঠলো শেরিনা। 'একেবারে চুপ। কোনো কথা বলবে না! বলটাকে বিরক্ত করবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো কিশোর।

টেবিলের ধার দু'হাতে খামচে ধরে নিচু হয়ে চকচকে বলটার দিকে তাকালো শেরিনা। পাথরের মতো স্থির। নিঃশ্বাস ফেলছে না। দীর্ঘ সময় পেরোলো। অবশেষে কথা বললো সে, বিড়বিড় করে, 'ট্রাংকটা দেখতে পাচ্ছি। লোক…অনেক লোক, অনেকেই চাইছে ওটা। আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি। ভয় পেয়েছে। ওর নামের প্রথম অক্ষর "ও"…না না, "ডি"। ভয় পেয়েছে, সাহায্য চাইছে। তোমাকে সাহায্য করতে বলছে। …টাকা! আরে, অনেক টাকা। অনেকেই চাইছে টাকাগুলো। কিন্তু ওগুলো লুকানো। ধোঁয়ার আড়ালে…মিলিয়ে যাচ্ছে। গেল, যাহ্। কেউ জানে না, কোথায় লুকালো।

'ধোঁয়া, না, মেঘে ঢেকে যাচ্ছে বলটা। লোকটা চলে যাচ্ছে। হারিয়ে গেল মানুষের দুনিয়া থেকে। না, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

সোজা হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মহিলা। 'বলের ভেতরে দেখতে খুব কষ্ট হয় আজকাল। বয়েস হয়েছে তো। একবার দেখলেই হাঁপিয়ে পড়ি। আজ আর দেখতে পারবো না। তা, যা যা বললাম, কিছু বুঝতে পেরেছো?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। গাল চুলকালো। 'কিছু কিছু। একটা ট্রাংক আছে আমার কাছে, অনেকেই চাইছে ওটা। আর ডি বোধহয় ডেটলারের নামের আদ্যক্ষর। দা গ্রেট ডেটলার।'

'দা গ্রেট ডেটলার,' বিড়বিড় করলো মহিলা, 'জিপসিদের বন্ধু। কিন্তু ও-তো হারিয়ে গেছে।'

'আপনি বললেন, মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। এর মানে কি?'

'বলতে পারবো না,' মাথা নাড়লো বৃদ্ধা। 'তবে বল মিছে কথা বলে না। আমরা, জিপসিরা ডেটলারকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে চাই, ও আমাদের বন্ধু। হয়তো তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তুমি চালাক। বয়েস কম বটে, কিন্তু অনেক বড় মানুষের চেয়ে তোমার নজর চোখা। এমন অনেক কিছুই দেখে ফেলো তুমি, যা বড়দেরও নজর এড়িয়ে যায়।'

'কিভাবে সাহায্য করবো বুঝতে পারছি না। ডেটলারের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না। আর টাকার কথা তো এই প্রথম শুনলাম। ডেটলারের পুরনো একটা ট্রাংক কিনেছি নীলামে। তার মধ্যে কথা-বলা একটা খুলি আছে, সক্রেটিস। ও-ই এখানে আসতে বললো আমাকে। ব্যস, আর কিছু জানি না।'

'দীর্ঘ যাত্রার শুরুতে প্রথমে একটা কদমই ফেলতে হয়,' রহস্যময় কণ্ঠে বললো মহিলা। 'তারপর আরেক কদম, তারপর আরও এক কদম, এভাবেই এগিয়ে যেতে হয়। যাও এখন। চোখ-কান খোলা রাখো। হয়তো আরও কিছু জানতে পারবে। ট্রাংকটা নিরাপদে রাখবে। সক্রেটিস আর কিছু বললে, মন দিয়ে শুনবে। শুভ-রাত্রি।'

উঠলো কিশোর। গোঁফওয়ালা সেই জিপসিটা হলের দরজার বাইরে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল তাকে।

ট্রাকেই বসে আছে বোরিস আর মুসা।

'এই যে, কিশোর, এসেছো,' দেখেই বলে উঠলো মুসা। 'আমরা নামতে যাচ্ছিলাম।' কিশোর পাশে উঠে বসলে বললো, 'কিছু হয়নি তো?'

'হয়েছে,' চুপ করলো কিশোর। গাড়ি ঘোরাচ্ছে বোরিস। ঘোরানোতক অপেক্ষা করলো সে, তারপর আবার বললো, 'মানে, হয়েছে অনেক কিছুই। কি হয়েছে বলতে পারবো না।'

'আরি। এটা কেমন কথা?'

সব খুলে বললো কিশোর।

শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'এ-তো পেটের অসুখের মিক্সচারের চেয়েও জটিল। মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। টাকা গিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়েছে। সব বাজে কথা। ফালতু বকর বকর।'

'ফালতু না হলেও, অদ্ভুত।'

'মানে? তোমার কি মনে হয় অনেক টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেটলারের ট্রাংকে? সক্রেটিসকে পেয়ে এতোই উত্তেজিত হয়েছিলাম আমরা, এরপর আর ভালো করে দেখা হয়নি অবশ্য। ট্রাংকে টাকা লুকানো থাকলে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। বুঝতে পারবো, ট্রাংকটার জন্যে পাগল হয়ে গেছে কেন লোকে।'

'আমিও তা-ই ভাবছি। সক্রেটিসের জন্যে নয়, আসলে টাকার জন্যেই পাগল হয়েছে ওরা। গিয়ে ভালো করে দেখবো।

আবার ট্রাংকে···কি হলো, বোরিস? হঠাৎ স্পীড বাড়ালেন!'

'পিছু নিয়েছে আমাদের,' ঘোঁৎঘোঁৎ করলো বোরিস। 'অনুসরণ করছে।' অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ আরও বাড়লো। 'কালো একটা গাড়ি। ভেতরে দু'জন লোক।'

ফিরে তাকালো কিশোর আর মুসা। পেছনের জানালা দিয়ে দেখলো গাড়িটা।

কাছে এসে গেল গাড়ি। ওদের পাশ কাটিয়ে আগে বাড়ার চেষ্টা করলো। সাইড দিলো না বোরিস। পথ এখানে সরু, সামনে আর কোনো গাড়ি নেই। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে চললো সে, কিছুতেই পাশ কাটাতে দিলো না পেছনের গাড়িটাকে।

আধ মাইল মতো চললো এভাবে। তারপর সামনে দেখা গেল ফ্রীওয়ে। ওরকম ফ্রীওয়ে অনেক আছে লস অ্যাঞ্জেলসে। শহরের জনবহুল এলাকাগুলোতেই এসব রাস্তা বেশি। চার থেকে আটটা গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারে এরকম চওড়া বড় বড় সব রাস্তা চলে গেছে মূল রাস্তার ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে, অনেকটা ওভারব্রিজের মতো। নিচের পথে লোক চলাচলের যাতে অসুবিধে না হয়, ট্র্যাফিক জ্যাম না ঘটে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এসব রাস্তায় ট্র্যাফিক লাইট থাকে না।

'ওপর দিয়ে যাবো,' বললো বোরিস। 'থামানোর চেষ্টা করতে পারবে না। পাশও কাটাতে পারবে না।'

বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ফ্রীওয়েতে উঠে গেল সে। দু'-

দিকেই গাড়ি চলাচল করছে।

পেছনের গাড়িটা বুঝলো, চেষ্টা করে আর লাভ নেই। সাইড পাবে না। থামাতে পারবে না ট্রাকটাকে। তাছাড়া ফ্রী-ওয়েতে থামা বেআইনী। নিচের রাস্তায় নেমে গেল ওটা, আর দেখা গেল না।

'ভুল করেছি,' আনমনে মাথা নাড়লো বোরিস। 'ব্যাটাদের ধরা উচিত ছিলো। ভালো করে মাথায় মাথায় ঠুকে দিলে আচ্ছা শিক্ষা হতো। কিশোর, কোথায় যাবো এবার?'

'বাড়ি,' জবাব দিলো কিশোর। 'মুসা, কি হয়েছে তোমার? অমন গুম হয়ে আছো কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। একটা মড়ার খুলি, রাতে কথা বলে। পুরনো একটা ট্রাংকের জন্যে লোকের আগ্রহ, আমাদের পিছু নেয়া, এসব মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। ভয় পাচ্ছি আমি কিশোর। এই রহস্যের কথা আমাদের ভুলে যাওয়াই উচিত।'

'ভুলতে চাইলেই কি আর ভোলা যায়?' চিন্তিত মনে হলো কিশোরকে। 'এটা এমন এক রহস্য, ভুলতে পারবো না। আমরা চাই বা না চাই, এর সমাধানও বোধহয় আমাদেরকেই করতে হবে।'

সাত

ইয়ার্ডে ফিরতেই ওদের ওপর কাজ চাপিয়ে দিলেন মেরিচাচী।

দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত রইলো ওরা। খাওয়ার সময় হলো। এই সময় এলো রবিন। খাবে না, মাথা নাড়লো, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। মুসা আর কিশোর খেয়ে নিলো। তারপর তিনজনে এসে ঢুকলো তাদের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে।

সকালের সমস্ত ঘটনা রবিনকে খুলে বললো কিশোর। সব শেষে বললো, 'শেরিনার কথায় যা বুঝলাম, বেশ কিছু টাকা কোনোভাবে হারিয়ে গেছে। আর এই টাকা হারানোর সংগে ডেটলারের গায়েব হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে।'

'হয়তো টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে ইউরোপে পালিয়ে গেছে,' বললো রবিন।

'না। শেরিনা বললো, ডেটলার সাহায্য চায়। মানুষের দুনিয়া থেকে সে হারিয়ে গেছে, আবার ফিরে আসতে চায়। জিপসিরা তাকে সহায়তা করতে রাজি। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। যা-ই হোক, টাকা নিয়ে ডেটলার নিখোঁজ হয়নি, টাকার

জনোই হয়েছে।'

'টাকাগুলো ট্রাংকে লুকানো আছে কিনা দেখলেই হয়,' মনে করিয়ে দিলো মুসা।

'কিন্তু কেন রাখতে যাবে ট্রাংকে? রাখুক আর না রাখুক, দেখি খুলে।'

ক্যানভাস সরিয়ে ট্রাংকটা বের করে আনা হলো।

আধ ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। ভেতরে যতো পুঁটুলি আছে, সব খুলে খুলে দেখলো। টাকার চিহ্নও নেই। দামী কোনো জিনিসও না।

'নেই,' হতাশ হয়ে একটা বাক্সের ওপর বসে পড়লো মুসা।

'ট্রাংক-সুটকেসের লাইনিঙের তলায় অনেক সময় টাকা লুকানো থাকে,' বলে উঠলো কিশোর। 'সিনেমায় দেখোনি? ওই যে, ওই কোণায় লাইনিং ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে।'

'ছেঁড়া তো ছোট,' বললো রবিন। 'ওর মধ্যে কটা টাকা আর ধরবে?' বলতে বলতে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো ফুটোর ভেতরে। 'আরে, আছে কি যেন!' চেঁচিয়ে উঠলো। 'কাগজ! বোধহয় টাকা!'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে সাবধানে বের করে আনলো ওটা। 'নাহ, টাকা তো না। পুরনো চিঠি।'

'দেখি তো,' হাত বাড়ালো কিশোর।

খামের ওপরে ডেটলার এবং একটা হোটেলের নাম লেখা। পোস্টমার্ক দেখে বোঝা গেল, বছরখানেক আগের চিঠি। ওই

সময়ই নিখোঁজ হয়েছিলো সে। তার আগেই ট্রাংকের লাইনিঙের ভেতরে লুকিয়ে ফেলেছিলো চিঠিটা। তারমানে, এটা গুরুত্বপূর্ণ।

'টাকার সূত্র হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে,' রবিন বললো। 'ম্যাপ-ট্যাপ কিছু আছে। দেখো না খুলে।'

খাম খুলে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। চিঠিই। লেখা আছে:

স্টেট প্রিজন হসপিটাল
জুলাই ১৭

ডিয়ার ডেটলার,

আমি ডেন কারমল। চিনতে পারছো নিশ্চয়ই? হাজার হোক, তুমি আমার বন্ধু, জেলে একই কামরায় ছিলাম। আমি এখন হাসপাতালে। আর বেশিদিন বাঁচবো না।

ঠিক কতোদিন বাঁচবো আর, বলতে পারবো না। পাঁচ দিনও হতে পারে, তিন হপ্তা, কিংবা হয়তো দু' মাস, ডাক্তাররা শিওর না। তবে টিকবো না আর। হয়তো তোমার কাছে এইই আমার শেষ চিঠি।

আরেকটা কথা, কখনও যদি শিকাগোয় যাও, আমার মামাতো ভাই ড্যানি স্ট্রীটের সংগে দেখা করো। তাকে আমার খবর জানিও। ইচ্ছে হচ্ছে আরো অনেক কিছু লিখি, কিন্তু পারছি না।

তোমার বন্ধু
ডেন।

'এ-তো সাধারণ একটা চিঠি,' পড়ে বললো মুসা। 'এটার কোনো গুরুত্ব নেই।'

'কি জানি,' মুসার সংগে একমত হতে পারলো না কিশোর, 'থাকতেও পারে।'

'ঠিকই। গুরুত্ব না থাকলে ডেটলার নিখোঁজ হবে কেন?' রবিন বললো।

'আমার মনের কথাটা বলেছো। কেন লুকালো? কারণ চিঠিটাকে গুরুত্ব দিয়েছে।'

মাথা চুলকালো মুসা। 'তবে টাকারসংগে এই চিঠির সম্পর্ক নেই।'

'জেল-হাসপাতাল থেকে চিঠিটা লিখেছে ডেন কারমল,' বললো রবিন। 'কয়েদীদের সব চিঠি ভালোমতো দেখে, পরখ করে তারপর বিলি করা হয়। টাকার কথা খোলাখুলি লেখা সম্ভব ছিলো না। জেল-কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে।'

'যদি না গোপন কোনো সংকেতের মাধ্যমে না লেখে,' রবিনের কথার শেষে যোগ করলো কিশোর।

'অদৃশ্য কালি-টালি দিয়ে লিখেছে বলতে চাইছো?' প্রশ্ন করলো মুসা।

'অসম্ভব না। চলো, ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা করি।'

ছই সুড়ঙের ঢাকনা সরিয়ে পাইপের ভেতরে ঢুকলো কিশোর। তার পেছনে রবিন। সব শেষে মুসা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা।

প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চিঠিটার প্রতিটি ইঞ্চি দেখলো কিশোর।

'কিছু নেই,' জানালো সে। 'দেখি অন্য টেস্ট করে।'

একটা জার থেকে খানিকটা অ্যাসিড নিয়ে কাচের বীকারে ঢাললো কিশোর। অ্যাসিডের বাষ্পের ওপর টান টান করে মেলে ধরলো চিঠিটা। নেড়েচেড়ে দেখলো। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

'যা ভেবেছি,' বললো সে। 'জেলখানায় অদৃশ্য কালি পাবে কোথায়? বড় জোর লেবু পাওয়া যাবে। লেবুর রস খুব সাধারণ অদৃশ্য কালির কাজ করে। ওই রস দিয়ে কাগজে লিখলে এমনিতে দেখা যায় না, কিন্তু কাগজটা গরম করলে লেখাগুলো ফোটে। তা-ই দেখি এবার।'

ছোট একটা গ্যাস বার্নার ধরালো কিশোর। কাগজটাকে শিখার ওপর ধরে গরম করতে লাগলো।

'নাহ্, কিছুই নেই,' বললো সে। 'দেখি খামটাতে কিছু আছে কিনা।'

কোন পরীক্ষারই ফল হলো না। খামেও পাওয়া গেল না লেখা।

হতাশ হলো কিশোর। 'সাধারণ চিঠিই বোধহয়। কিন্তু তাহলে লুকিয়ে রাখলো কেন ডেটলার?'

'হয়তো ভেবেছে সূত্র-টুত্র আছে এটাতে, তারপর আর পায়নি,' রবিন বললো। 'শোনো, এমনও হতে পারে, জেলে

থাকতেই লুকানো টাকার কথা ভেটলারকে বলেছে কারমল, কোথায় আছে সেটা বলেনি। হয়তো এ-ও বলেছে, তার যদি কিছু হয়ে যায়, টাকাগুলো যেন খুঁজে বের করে ভেটলার।

'তারপর সত্যি সত্যি অসুখে পড়লো কারমল। এমন অসুখ, আর বাঁচবে না। বন্ধুকে চিঠি লিখলো সে। অন্যের কাছে না, হলেও হয়তো ভেটলারের কাছে চিঠিটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তাই লুকিয়ে রেখেছে।

'কথাটা গোপন থাকেনি। কোনোভাবে জেনে গেছে আর কেউ, হয়তো ওই জেলেরই অন্য কোনো কয়েদী। ভেটলার আর কারমলের মাঝে পত্র বিনিময় যে হত, এটাও জেনেছে। জানিয়ে দিয়েছে তার বাইরের বন্ধুদেরকে। তাদের ভয়েই গা ঢাকা দিয়েছে ভেটলার। পুলিশের কাছে যেতে পারেনি, কারণ, কি বলবে পুলিশকে? না লুকিয়েও উপায় ছিলো না। টাকা কোথায় আছে, এই কথা আদায়ের জন্যে তার ওপর অত্যাচার চলতে পারে। ঠিক বলছি?'

'যুক্তি আছে,' স্বীকার জানালো কিশোর। 'হয়তো এরকমই কিছু ঘটেছে। তবে এই চিঠি ছাড়া আর কিছু পাঠাতে পারেনি কারমল, পুলিশের সন্দেহ হবে এরকম কিছু পাঠানোও সম্ভব ছিলো না। পুলিশের হাত হয়েই আসে।'

'চিঠিতেও কিছু নেই, ট্রাংকেও নেই,' মুসা বললো, 'তাহলে এটা রেখেছি কেন আমরা? লোকে পাগল হয়ে গেছে এটার

জন্যে। এটা হাতে পাওয়ার জন্যে দরকার হলে মানুষ মারতেও দ্বিধা করবে না ওরা, আমি শিওর। খামোখা এটা রেখে বিপদে পড়ে লাভ কি?'

কেউ জবাব দিলো না।

'আমি বলি কি,' আবার বললো মুসা, 'হ্যামলিনকেই দিয়ে দেয়া যাক। কড়কড়ে নিরানব্বই ডলার লাভ।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'শেরিনা বলছিলো, আমরা সাহায্য করতে পারবো। এখন আর আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, হ্যামলিনকেই ফোন করে দিই, এতোই যখন চাইছে। তবে, একশো ডলার নিচ্ছি না আমি। এক ডলারে কিনেছি, এক ডলারেই বেচবো। লাভের অংকে দরকার নেই।'

'নিরানব্বই ডলার ছেড়ে দেবে?'

'দেবো। ট্রাংকটা এখন আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আরেকজন লোক নিয়ে গিয়ে বিপদেও পড়বে, একশো ডলারও খরচ করবে, এটা বোধহয় উচিত না।...দাঁড়াও, আগে চিঠিটার ছবি তুলে নিই।'

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে চিঠি আর খামের কয়েকটা ছবি তুললো কিশোর। তারপর ফোন করলো হ্যামলিনকে।

খাদক জানালো, রওনা দিচ্ছে সে।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। চিঠিটা আবার রেখে দিলো লাইনিঙের ভেতরে, আগের জায়গায়। ট্রাংকের জিনিসপত্র যেটা যেখানে যেভাবে ছিলো, সেভাবেই

রাখলো যতোটা সম্ভব। শেষে, সক্রেটিসকে আনতে ঘরে চললো কিশোর।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলো আতংকিত চোখে খুলিটার দিকে তাকিয়ে আছেন মেরিচাচী।

'কিশোর!' দেখেই বলে উঠলেন তিনি। 'ওটা···ওটা···' বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

'কি, চাচী?'

'ওটা···জানিস কি করেছে? আমাকে টিটকারি দিয়েছে।'

'টিটকারি?'

'হ্যাঁ। ঘরটা পরিষ্কার করতে ঢুকলাম, আর ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা···,' রেগে উঠলেন তিনি। 'কাল রাতেই তোকে বলে-ছিলাম ফেলে দিয়ে আসতে। যা, এক্ষুণি নিয়ে যা···'

'তোমার সংগে রসিকতা করেছে আরকি। যাদুকরের জিনিস তো,' মুচকি হাসলো কিশোর।

'হাসছিস! তুই হাসছিস! আমার সংগে রসিকতা করে··· আর একটা কথা বলবি না। যা, নিয়ে যা ওটা এখান থেকে। সাবান দিয়ে হাত না ধুয়ে আর ঘরে ঢুকবি না।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি,' হাত তুললো কিশোর। 'ওটা নেয়ার জন্যেই এসেছি।'

'বাড়ির ধারেকাছে যেন না থাকে। দূরে কোথাও ফেলবি। হতচ্ছাড়া খুলি···বেঁচে থাকতেও নিশ্চয় খুব শয়তান ছিলো লোকটা···'

খুলি আর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা নিয়ে ওয়ার্কশপে ফিরে এলো কিশোর। মেরিচাচীকে যে টিটকারি দিয়েছে খুলি, একথা জানালো দুই সহকারীকে।

'আশ্চর্য!' রবিন বললো। 'মেরিচাচীকে টিটকারি দিতে যাবে কেন?'

'বেশি রসিক আরকি,' বললো মুসা। 'ভরো, এটাকে কাপড়ে প্যাঁচাও। বিদেয় হোক।'

'ভাবছি,' গালে আঙুল রাখলো কিশোর, 'রেখেই দেবো নাকি এটাকে? ট্রাংকটাও? আরও কিছু পরীক্ষা···'

'না না, কোনো দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে খুলি-টা প্যাঁচাতে শুরু করলো মুসা। 'মেরিচাচী বলেছে ফেলে দিয়ে আসতে, এরপর আর রাখা যাবে না। তাছাড়া হ্যামলিনকেও কথা দিয়ে ফেলেছি। ও চলে আসছে। জাহান্নামে যাক বেতমিজ খুলি, ভদ্রমহিলার সম্মান করতে জানে না। আর কিশোর, তোমাকেও বলি, সব রহস্যেরই সমাধান করতে হবে আমাদের, এমন কোনো খত তো কারো কাছে লিখে দিইনি।'

দড়াম করে ট্রাংকের ডালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো সে।

তর্ক করতে যাচ্ছিলো কিশোর, বাধা পড়লো বোরিসের ডাকে। 'কিশোর? এই কিশোর, কোথায় তোমরা? এক ভদ্র-লোক দেখা করতে এসেছেন।'

বাইরে বেরিয়ে দেখলো ওরা, যাদুকরই।

'এই যে, ছেলেরা,' বলে উঠলো হ্যামলিন। 'ডেটলারের ট্রাংক শেষতক বেরোলো।' এমন একটা ভাব করলো, যেন এটা তার নিজেরই কৃতিত্ব, যাদুর জোরে বের করেছে।

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'নিয়ে যেতে পারেন।'

হাত ঝাঁকুনি দিলো যাদুকর। বেরিয়ে এলো একশো ডলার

'এতো টাকা লাগবে না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'এক ডলার দিলেই হবে।'

গম্ভীর হলো যাদুকর। 'আমার ওপর কেন এই দয়া, জানতে পারি? ভেতরের জিনিসপত্র কিছু রেখে দিয়েছো নাকি?'

'না। যা ছিলো, সবই আছে। সত্যি কথাই বলি, ট্রাংকটা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অনেকেই চাইছে এটা। শেষে কোন বিপদে পড়বো...'

'বুঝলাম,' হাসলো যাদুকর। 'সব বিপদ তাই আমার ঘাড়ে চালান করে দিতে চাইছো। দাও, আমি ওসবের পরোয়া করি না। একশো ডলার নিলেও পারতে। ইচ্ছে করে দিচ্ছি।'

'না, এক ডলার।'

'বেশ,' কিশোরের কানের কাছে হাত নিয়ে এলো হ্যামলিন। কানের ভেতর থেকে টেনে বের করলো এক ডলার। 'নাও।'

ট্রাংকটা এনে দেয়া হলো যাদুকরকে। ওটা গাড়ির পেছনের সিটে তুলে দিতে অনুরোধ করলো সে। ধরাধরি করে তার নীল স্যালুনে তুলে দিলো ছেলেরা। কেউই খেয়াল করলো না,

তাদেরকে লক্ষ্য করছে দুই জোড়া চোখ।

গাড়িতে উঠলো হ্যামলিন। 'এরপর কোথাও যাদু দেখাতে গেলে তোমাদের নিয়ে যাবো সংগে করে।'

'থ্যাংকি, স্যার,' বললো কিশোর।

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

'যাক, বাবা, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'হ্যামলিন নিয়ে গিয়ে কি করবে? নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখবে খুলিটা কিভাবে কথা বলে? দেখুকগে। যা খুশি করুক, আমাদের কি? আমাদের ঘাড় থেকে তো নামলো।'

আট

সারাটা বিকেল আর কিছু ঘটলো না।

সকাল সকাল বাড়ি ফিরলো রবিন। দেখে, তার বাবা বাড়িতেই বসে আছেন। এসময়ে সাধারণত বাইরেই থাকেন তিনি। বড় পত্রিকায় কাজ করেন, তাই অনেক কাজ থাকে। আজ হয়তো কাজ নেই, বাড়ি চলে এসেছেন।

'রবিন,' খাবার টেবিলে খেতে বসে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'পত্রিকায় তোমাদের ছবি দেখলাম। পুরনো একটা ট্রাংক নাকি নীলামে কিনে এনেছো? ভেতরে ইন্টারেসটিং কিছু পেলে?'

'পেয়েছি। একটা কথা-বলা খুলি। নাম সক্রেটিস।'

'কথা-বলা খুলি, তার নাম আবার সক্রেটিস!' আঁতকে উঠলেন যেন মিসেস মিলফোর্ড। 'কথা বলেছে নাকি তোর সংগে?'

'না, মা, আমার সংগে বলেনি।' কিশোরের সংগে বলেছে একথা বলতে গিয়েও বললো না।

'ম্যাজিশিয়ানের জিনিস তো। কোনোরকম চালাকি করে রেখেছে ভেতরে,' হেসে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কি যেন নাম···'

'ডেটলার···'

'লোকটা নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের ভেনট্রিলোকুইস্ট ছিলো। কিশোর রেখে দিয়েছে নাকি খুলিটা?'

'না, বেচে দিয়েছে। আরেক যাদুকর এসে কিনে নিয়ে গেছে, ডেটলার নাকি তার বন্ধু ছিলো। নাম কি একেকজনের। দা গ্রেট ডেটলার, হ্যামলিন দা মিসটিক···'

'কি বললে?' মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হ্যামলিন দা মিসটিক? অফিস থেকে বেরোনোর আগেই তো শর্ট নিউজ করে দিয়ে এলাম। বিকেলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

হ্যামলিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? অবাক হয়ে ভাবলো রবিন, খুলিটা দুর্ভাগ্যের কারণ হলো না তো···তার ভাবনায় বাধা পড়লো। মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'ইয়টে করে সাগরে বেরোবে নাকি?' ছেলের চেহারার পরিবর্তন দেখে হাসলেন। 'আগামী রোববার। আমার এক বন্ধু তার ইয়টে দাওয়াত করেছে। ক্যাটালিনা আইল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবে।'

'তাই নাকি!' খাওয়া ভুলে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। হ্যামলিনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। পরদিন সকালে যখন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এলো, তখনও মনে পড়লো না কথাটা।

পুরনো একটা ওয়াশিং মেশিন সারাতে ব্যস্ত কিশোর আর

মুসা। রবিনও সাহায্য করলো তাদেরকে।

শেষ হলো কাজ। মেশিনটা সবে চালু করেছে কিশোর, এই সময় একটা গাড়ি ঢুকলো ইয়ার্ডে। পুলিশের গাড়ি। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার নামলেন গাড়ি থেকে। 'হাল্লো, বয়েজ,' এগিয়ে এলেন তিনি। 'তোমাদের সংগে কথা আছে।'

'কথা?' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

'হ্যাঁ। হ্যামলিন নামে এক লোকের কাছে গতকাল তোমরা একটা ট্রাংক বিক্রি করেছিলে। কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লোকটা। গাড়িটার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, সে-ও বেশ ব্যথা পেয়েছে। এখন হাসপাতালে। প্রথমে ভেবেছিলাম সাধারণ দুর্ঘটনা। লোকটা বেহুঁশ ছিলো, কথা বলতে পারেনি।

'আজ সকালে হুঁশ ফিরেছে। জানালো, আরেকটা গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে রাস্তা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। ওই গাড়িটাতে দু'জন লোক ছিলো। ট্রাংকটার কথাও বললো। ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে, যারা ধাক্কা মেরেছিলো। ভাঙা গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর মধ্যে ট্রাংকটা নেই।'

'ট্রাংকের জন্যেই হ্যামলিনের গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিলো ওরা?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর।

'তাই তো মনে হয়। হ্যামলিন বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। ডাক্তার কথা বলতে দেয়নি তাকে। তোমাদের কাছ থেকে যে কিনেছে, এটা জানিয়েছে যাদুকর। তাই এলাম। ট্রাংকে কি ছিলো?'

'কি ছিলো?' মুসা আর রবিনের দিকে তাকালো একবার কিশোর। 'বেশির ভাগই পুরনো কাপড়। আর ম্যাজিক দেখানোর কিছু জিনিস। আরেকটা জিনিস ছিলো, একটা কথা-বলা খুলি।'

'কথা-বলা খুলি! খুলি কথা বলবে কিভাবে?'

'সাধারণত বলে না,' স্বীকার করলো কিশোর। 'কিন্তু ওটা বলতে পারে। ওটার মালিক ছিলো দা গ্রেট ডেটলার নামে এক যাদুকর।' ফ্লেচারকে সব কথা খুলে বললো সে।

চুপচাপ শুনলেন চীফ। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ালেন। কিশোরের কথা শেষ হলে বললেন, 'স্বপ্নও হতে পারে। হয়তো স্বপ্ন দেখেছো।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঠিকানামতো গিয়ে বাড়িটা পেয়েছি। শেরিনা নামে এক জিপসি মহিলার সংগে দেখা হয়েছে। ডেটলারের সব কথা জানে সে। বললো, মানুষের দুনিয়ায় নাকি নেই এখন ডেটলার।'

কপালের ঘাম মুছলেন ফ্লেচার। 'কাচের বলের ভেতরে টাকা দেখেছে?··· আশ্চর্য!···চিঠিটার ছবি তুলে রেখেছো বললে। দেখাবে?'

'নিশ্চয়, স্যার। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।'

ওয়ার্কশপে এসে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো কিশোর। সকালেই ছবি ডেভেলপ করে রেখেছে। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে শুকানোর জন্যে। ওগুলো খুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো

আবার ট্রেলার থেকে।

ভালো করে দেখলেন চীফ। মাথা নাড়লেন, 'সাধারণ চিঠি মনে হচ্ছে। নিয়ে যাই, পরে পরীক্ষা করে দেখবো। শেরিনার সংগে দেখা করা দরকার। চলো না এখনই যাই।'

রবিন আর মুসা আশা করলো তাদেরকেও সংগে যেতে বলবেন চীফ, কিন্তু বললেন না। দু'জনকে ইয়ার্ডেই থাকতে বলে পুলিশের গাড়িতে গিয়ে উঠলো কিশোর।

'অফিশিয়ালি যাচ্ছি না,' জানালেন ফ্লেচার। 'হয়তো আমাকে কিছুই বলতে চাইবে না, চাপাচাপিও করতে পারবো না। ওয়ারেন্ট নেই, অ্যারেস্টও করতে পারবো না।'

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না।

সেই বাড়িটার সামনে এসে থামলো গাড়ি। কিশোর নামলো আগে। বারান্দায় উঠে সিঁড়ি পেরিয়ে দরজার সামনে এসে বেল বাজালো।

সাড়া নেই।

আরও কয়েকবার বেল বাজিয়েও সাড়া মিললো না।

এই সময় সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা। পুলিশের গাড়ি দেখে থামলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চান? জিপসিদের? ওরা তো নেই। চলে গেছে।'

'চলে গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'কোথায়?'

'কোথায় গেছে কে জানে? জিপসিরা কি আর বলে যায়? আজ এখানে কাল ওখানে। আজ সকালে দেখলাম পুরনো

কতোগুলো গাড়ি এলো। মালপত্র বোঝাই করে চলে গেল লোকগুলো। আমাদের সংগে একটা কথাও বললো না কেউ।'

নয়

'বুঝলে,' কিশোর বললো, 'কাজ থাকলেই ভালো। এই যে এখন হাতে কোনো কাজ নেই, সময় কাটতেই চাইছে না। সাড়াটা দিনই তো পড়ে আছে। কি করবো?'

হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। চীফ ইয়ান ফ্লেচার এসেছিলেন, তার পর দুটো দিন পেরিয়ে গেছে। ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত থেকেছে ওরা। পরিশ্রম হয়েছে ঠিক, কিন্তু সময়টা যেন উড়ে চলে গেছে। আজ কোনো কাজ নেই, তাই ভালো লাগছে না।

'অনেক দিন সাঁতার কাটি না। চলো সাঁতার কেটে আসি,' প্রস্তাব দিলো মুসা।

'হ্যাঁ, আমি রাজি,' বললো রবিন। 'যা গরম পড়েছে না। ভালোই লাগবে।'

ঠিক এই সময় বাজলো টেলিফোন।

কমবেশি চমকে উঠলো তিনজনেই।

আরেকবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিলো কিশোর। স্পীকারের লাইন অন করে দিলো। 'হ্যালো। কিশোর পাশা বলছি।'

'কিশোর,' ইয়ান ফ্লেচারের কণ্ঠ, 'অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমার চাচী এই নম্বরটা দিলো।'

'বলুন, স্যার?'

'চিঠিটা পরীক্ষা করলাম। ডেন কারমল আর গ্রেট ডেটলারেরও খোঁজখবর নিয়েছি। কয়েকটা কথা জানা গেছে। এখন একবার আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'এখুনি আসছি। বেশি হলে বিশ মিনিট লাগবে।'

কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখার সংগে সংগে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'কেন রাজি হলে? ট্রাংকটা পার করে দিয়ে তো বেঁচেছিলাম। আবার কেন গান্ধা ব্যাপারটায় নাক গলাতে যাচ্ছো?'

'ঠিক আছে, না যেতে চাইলে নেই,' কিশোর বললো। 'আমি একাই যাচ্ছি।'

মুসার চেহারা দেখে হেসে ফেললো রবিন। যেতে মনও চায়, আবার ভয়ও পায়, মুসার স্বভাবই হলো এরকম।

'তুমিও যাবে নাকি?' রবিনকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'হ্যাঁ।'

'দূর। তাইলে আমি আর একা বসে থেকে কি করবো? চলো, আমিও যাই। থানা থেকে ফিরে এসে কিন্তু সাঁতার কাটতে যাবো, হ্যাঁ।'

'সেটা দেখা যাবে,' কিশোর বললো। 'চলো, বেরোই।'

সাইকেল নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

থানার বাইরে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। প্রথম ঘরটায় একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন একজন পুলিশ অফিসার। ছেলেদের দেখে হাত নেড়ে বললেন, 'যাও, চীফ বসে আছেন।'

ছোট একটা হলঘরে ঢুকলো ওরা। একপাশে বন্ধ দরজার কপালে লেখা 'চীফ অভ পুলিশ'। দরজায় টোকা দিতেই সাড়া দিলেন ফ্লেচার।

ভেতরে ঢুকলো ছেলেরা।

নিরবে সিগার টানছিলেন চীফ। ছেলেদের বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'কয়েকটা ইনটারেসটিংখবর জেনেছি। তোমরা জানো, জেলে একই সেলে থাকতো ডেটলার আর ডেন কারমল। খবর নিয়ে যা বুঝলাম, কারমল ব্যাংক ডাকাতিতে জড়িত।'

'ব্যাংক ডাকাত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'হ্যাঁ। ছয় বছর আগে ডাকাতির অপরাধেই তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাঁচ লাখ ডলার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায় স্যান ফ্রানসিসকো থেকে। এক মাস পর ধরা পড়ে শিকাগোয়। অতি সামান্য একটা কারণে ধরাটা পড়ে, পার প্রায় পেয়ে গিয়ে-

ছিলো। ওর কথায় ছোট্ট একটা দোষ আছে, "এল" অক্ষরটা উচ্চারণ করতে পারে না। ডাকাতির সময় সেটা খেয়াল করেছিলো ব্যাংকের এক ক্লার্ক, লোকটা খুব চালাক। পুলিশকে সে-ই একথা বলেছে।

'কারমল ধরা পড়লো, কিন্তু টাকাগুলো পাওয়া গেল না। লুকিয়ে ফেলেছিলো। সে যে ওই টাকা ডাকাতি করেছে, এটাই তার মুখ থেকে আদায় করা যায়নি। অনেক চেষ্টা করেছে পুলিশ, স্বীকার করাতে পারেনি তাকে দিয়ে।

'এখন, শুরু থেকে এক এক করে ধরো। ছয় মাস আগে, শিকাগোয় অ্যারেস্ট হয়েছে কারমল, ডাকাতির এক মাস পর। টাকাগুলো কোথায় লুকালো? শিকাগোয়ও হতে পারে। লস অ্যাঞ্জেলসেও হতে পারে।

'লস অ্যাঞ্জেলসের কথা বলছি এজন্যে, জানা গেছে, শিকাগোয় যাওয়ার আগে লস অ্যাঞ্জেলসে তার বোনের বাড়িতে এক হপ্তা ছিলো কারমল। মহিলার নাম মিসেস লারমার, নিরা লারমার। তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশের কাজে আসে এমন কিছুই জানাতে পারেনি মহিলা। মিসেস লারমার ভালো মানুষ, তার ভাইয়ের কুকর্মের কথা কিছুই জানতো না। পুলিশ গিয়ে বলার পর তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। তার বাড়িতে কোনো জায়গা খুঁজতে বাকি রাখেনি পুলিশ, টাকা পাওয়া যায়নি।

'তারমানে, ধরে নেয়া যায়, বোনের বাড়ি থেকে বেরোনোর

সময়ও টাকাগুলো কারমলের সংগেই ছিলো। তাহলে, শিকাগোয় নিয়ে গিয়ে লুকানোও অসম্ভব নয়।'

'ডেটলারের কাছে চিঠিতে শিকাগোর কথা বলেছে কারমল,' কিশোর বললো। 'তার এক মামাতো ভাইয়ের নাম বলেছে, ড্যানি স্ট্রীট। তার ওখানে রাখেনি তো?'

'জেল কর্তৃপক্ষ ভেবেছে এটা, কিশোর। ডেটলারের কাছে পাঠানোর আগে ভালোমতো পড়েছে, নানা ভাবে দেখেছে। শিকাগো পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু একজন স্ট্রীটের সংগেও কারমলের সম্পর্কের কথা জানাতে পারেনি। কয়েকজন স্ট্রীটকে পাওয়া গেছে, কেউ বলেনি যে তারা কারমলকে চেনে।

'চিঠিতে কোনো রকম কারসাজি নেই এ-ব্যাপারে শিওর হয়েই ডেটলারের কাছে পাঠিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। ওটাতে সাংকেতিক কিছু আছে কিনা, তা-ও বোঝার চেষ্টা করেছে। পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে হয়েছে চিঠিটা নিছকই একটা চিঠি।'

'আমিও অনেক ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি, বুঝতে পারিনি কিছু,' কিশোর বললো। বার দুই চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। 'আমার ধারণা, আরও কেউ জেনে গেছে চিঠিটার কথা। হয়তো ভেবেছে টাকা কোথায় লুকানো আছে তার ইঙ্গিত রয়েছে চিঠিতে। তাই ওটা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলো। ডেটলারের পিছু লেগেছিলো। আর তাতেই ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ম্যাজি-

শিয়ান।'

'খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে কিনা তাই বা কে জানে,' বললেন চীফ। 'আমার মনে হয়, টাকাটা পায়নি ডেটলার, তার হাতেই পড়েনি। কিন্তু অন্যেরা ভেবেছে, পেয়েছে। কথা আদায়ের জন্যে হয়তো অত্যাচার করেই মেরে ফেলেছে। কিংবা, তুমি যা বললে, ভয়ে ট্রাংক ফেলেই পালিয়েছে।'

'তাহলে বলতে হবে, চিঠিটাতে টাকার ইঙ্গিত রয়েছে এটা বুঝতে পেরেছিলো ডেটলার, নইলে লুকাবে কেন ওটা? ধরা যাক, সে গা ঢাকা দিয়েছে। হোটেলে ট্রাংক আছে কি নেই, খুঁজতে যায়নি অপরাধীরা। হয়তো জানতোই না। তারপর পত্রিকায় পড়েছে, আমি ডেটলারের একটা ট্রাংক কিনেছি। হয়তো সন্দেহ হয়েছে, ওই ট্রাংকের মধ্যেই টাকা লুকানো আছে।

'পয়লা দিন রাতেই তাই ট্রাংকটা চুরি করতে চেয়েছিলো। পায়নি। তারপর থেকে সারাক্ষণ ইয়ার্ডের ওপর চোখ রেখেছে। হ্যামলিন গাড়িতে করে ট্রাংক নিয়ে যাচ্ছে দেখে পিছু নিয়েছে। পথে ধাক্কা দিয়ে তার গাড়ি ফেলে দিয়ে ট্রাংকটা নিয়ে চলে গেছে।'

'আমাদের বিপদটা বেচারা হ্যামলিনের ওপর দিয়ে গেল,' বলে উঠলো মুসা।

'আমাদেরকে দোষ দিতে পারবে না,' রবিন বললো। 'আমরা তাকে একথা বলেছি। ও বললো, কারও পরোয়া করে

না। বিপদকে ভয় পায় না।'

'যা হবার তো হয়েই গেছে, ওসব বলে আর লাভ নেই,' বললেন ফ্লেচার। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝা গেল, মূল্যবান কিছু একটা আছে ওই ট্রাংকে। অযথা ওটার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে না ওরা।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'এখন ধরো,' বলে গেলেন চীফ, 'ট্রাংকের ভেতরে মূল্যবান কিছু পেলো না। তখন কি করবে?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। ঢোক গিললো।

মুসা নির্বিকার, চীফের কথার অর্থ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু রবিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওরা ভাববে, আমরা পেয়ে বের করে নিয়েছি! হয় মেসেজ, কিংবা টাকা, রেখে দিয়ে তার-পর ট্রাংকটা বেচেছি হ্যামলিনের কাছে!'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। জোরে জোরে হাত নাড়লো, 'আমরা···আমরা কিচ্ছু পাইনি! কসম খোদার!'

'আমি জানি,' বললেন চীফ। 'কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করবে?'

'বিপদটা বুঝতে পারছি, স্যার,' মুখ কালো করে বললো কিশোর।

'হ্যাঁ, সেটা বুঝেই তোমাদেরকে ডেকেছি, হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে। ইয়ার্ডের কাছে কাউকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা ফেরা করতে দেখলেই টেলিফোন করবে আমাকে। ফোন বা অন্য কোনোভাবে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় তোমাদের

সংগে, তাহলেও জানাবে আমাকে। বুঝেছো?'

'বুঝেছি, বললো রবিন।

'একটা অসুবিধে আছে,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'নানা রকম লোক আসে ইয়ার্ডে। কাউকে সন্দেহ করা কঠিন। তবু, তেমন মনে হলেই জানাবো আপনাকে।'

'এক মুহূর্ত দেরি না করে।'

দশ

'তখনই বলেছিলাম ওই হতচ্ছাড়া ট্রাংক কেনার দরকার নেই,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে মুসা। 'শুনলে না। ওরা ডাকাত। ধাক্কা দিয়ে হ্যামলিনের গাড়ি ফেলে দিয়েছে, তারমানে ও মরলেও কেয়ার করতো না। আমাদের ব্যাপারেও করবে না।'

'অথচ ট্রাংকটা বিদেয় করে দিয়ে ভাবলাম, বেঁচেছি,' রবিন বললো। 'কিশোর, কোনো উপায় বের করেছো?'

কথা হচ্ছে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে বসে।

কিশোরও গম্ভীর। 'সত্যি বলবো? আমিও ভয় পাচ্ছি এখন। লোকগুলো, ওরা যারাই হোক, টাকা বের না করে ছাড়বে না। বাঁচার একটাই উপায় আছে আমাদের, টাকাগুলো খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া।'

'চমৎকার! খুব চমৎকার!' টিটকারির ভঙ্গিতে বললো মুসা। 'টাকা খুঁজে বের করবো। এতোই সোজা। পুলিশ পায়নি।

চোরডাকাতেরা পাচ্ছে না। আর আমরা বের করে ফেলবো।'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' রবিন বললো। 'কি করে বের করবো? কোনো সূত্রই আমাদের হাতে নেই।'

'কাজটা সহজ হবে না,' স্বীকার করলো কিশোর। 'তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও শান্তি পাবো না, শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না আমাদেরকে।'

গুঙিয়ে উঠে বিড়বিড় করে কি বললো মুসা, সে-ই বুঝলো শুধু।

'শুরুটা কিভাবে করবো?' রবিনের প্রশ্ন।

'প্রথমে, ধরে নিতে হবে, টাকাগুলো লস অ্যাঞ্জেলসেই কোথাও আছে। শিকাগোয় থাকলে বের করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

লস অ্যাঞ্জেলসে থাকলেও যে সাধ্যের বাইরে, এটা বলে দিলো মুসা।

'তারপর,' মুসার কথায় গুরুত্ব দিলো না কিশোর, 'জানতে হবে, বোনের বাড়িতে থাকার সময় কি কি করেছিলো ডেন কারমল। তারমানে মিসেস লারমারের বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, ওখানে যেতে হবে, তার সংগে কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু পুলিশ তো জিজ্ঞাসাবাদ করেছে,' রবিন যুক্তি দেখালো, 'ওরা কিছু জানতে পারেনি। আমাদেরকে নতুন আর কি বলবে?'

'জানি না। তবু চেষ্টা করতে হবে। এটাই এখন আমাদের একমাত্র সূত্র। কিছুই যখন করার নেই, এখন অন্তত এই একটা

কাজ তো করতে পারি।'

'ওই দিন খবরের কাগজ পড়াটাই তোমার উচিত হয়নি,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'তো, এখন কি করতে হবে আমাদের?'

'প্রথমে···,' বলতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর।

বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, কোথায় তোরা? খাবার দিয়েছি, জলদি আয়। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। 'হ্যাঁ, এটাই হলো গিয়ে কাজের কথা। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর এতক্ষণে এই একটা ভালো কথা শুনলাম।'

খেতে বসলো ছেলেরা।

রাশেদ পাশাও এসে বসলেন তাদের সংগে।

'তারপর, কিশোর?' বললেন তিনি। 'কি কাজে ব্যস্ত এখন! জিপসিদের সংগে দোস্তি করছো?'

'জিপসি?' অবাক হয়ে চাচার দিকে তাকালো কিশোর।

রবিন আর মুসার হাতের চামচও থেমে গেল।

'আজ সকালে দু'জন জিপসি এসেছিলো ইয়ার্ডে,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'তোমরা তখন ছিলে না। ওরা বলেনি যে ওরা জিপসি, পরনের কাপড়ও জিপসিদের মতো ছিলো না। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। যাযাবর হয়ে জীবন কাটাতে কেমন লাগে, দেখার শখ হয়েছিল একবার,' চট করে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন, রান্নাঘর থেকে মেরিচাচী আসছে কিনা। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'ব্যস, চলে

গেলাম। অনেকদিন থেকেছি জিপসিদের মাঝে। খারাপ লাগেনি। স্বাধীন জীবন, কোনো বাধা নেই···'

'তুমি জিপসি হয়েছিলে?' কিশোর বললো। 'কই, কখনও বলোনি তো? আর কি কি করেছো তুমি?'

নিরবে হাসলেন রাশেদ পাশা। বিশাল গোঁফে তা দিলেন একবার। ভাবখানা, সময়মতো জানতে পারবে।

ওসব কথা চাচা আর কিছু বলবে না বুঝে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ওই দু'জন কি আমাকে খুঁজছিলো?'

'মনে তো হলো তোমাকেই খুঁজছে,' বললেন রাশেদ পাশা। 'আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, কোঁকড়া-চুল ছেলেটা কোথায়? কি জন্যে, জানতে চাইলাম। বললো, তোমার এক বন্ধুর কাছ থেকে বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

'কি সংবাদ?' হাত থেকে চামচ রেখে দিলো কিশোর।

হাসি বিস্তৃত হলো রাশেদ পাশার। 'মনে তো হলো একটা ধাঁধা দিয়ে গেছে। "এক পুকুরে নাকি একটা ব্যাঙ পড়েছে। ব্যাঙথেকো মাছেরা ওটার পিছে লেগেছে। জোরে জোরে লাফাচ্ছে ব্যাঙটা পানি থেকে উঠে আসার জন্যে।" বুঝেছো কিছু?'

চামচ দিয়ে প্লেটের কিনারে আলতো বাড়ি দিলো কিশোর, হাত কাঁপছে। মুসা আর রবিনের মুখ ফ্যাকাশে।

'কি জানি?' বললো কিশোর। 'তুমি শিওর, ওরা জিপসি?'

'শিওর। সরে গিয়ে নিচু গলায় কি বলাবলি করছিলো ওরা, নিজেদের ভাষায়। রোম্যানি মোটামুটি জানা আছে আমার। সব

কথা শুনলাম না, তবে "বিপদ", আর "কড়া চোখ রখেতো হবে", এই শব্দগুলো কানে এসেছে। বিপজ্জনক কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়োনি তো?'

'এই, কিসের বিপদ?' মেরিচাচীর কথায় চমকে উঠলো চারজনেই। ট্রে হাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ওঘর থেকে শুনছি খালি জিপসি জিপসি করছো? এই কিশোর, কি হয়েছে রে? মরার খুলি ফেলে এসে এখন জিপসিদের সংগে গিয়ে মিশেছিস নাকি?'

'না, চাচী...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন রাশেদ পাশা, 'কেন, জিপসিদের সংগে মিশলে খারাপটা কি? ওরা লোক খুব ভালো।'

'মিস্টার রাশেদ পাশা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'তোমার মিশতে ইচ্ছে করলে খুব মেশো গিয়ে। ছেলেগুলোর মাথা খেও না।'

খাবার টেবিলে কুরুক্ষেত্র বাধানোর ইচ্ছে হলো না রাশেদ পাশার। হেসে বললেন, 'জো হুকুম, বেগম সাহেবা।' বড় একটা চিংড়ির কাটলেটের অর্ধেক মুখে পুরে এক চিবান দিয়েই বলে উঠলেন, বাহ্, দারুণ রেঁধেছো তো।'

'হয়েছে হয়েছে, আর ফোলাতে হবে না।' আরেকদিকে মুখ ফেরালেন চাচী। খুশি যে হয়েছেন, সেটা দেখতে দিতে চান না কাউকে।

মুচকি হেসে কনুই দিয়ে মুসার গায়ে আলতো গুঁতো দিলো কিশোর।

আর কোনো কথা হলো না। নিরবে খাওয়া শেষ করে হেডকোয়ার্টারে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

'জিপসির সংবাদ,' ঢুকেই বললো মুসা। 'পুকুরে ব্যাঙ পড়েছে বলে কি বোঝাতে চায়? হুমকি দিচ্ছে?'

'তাই তো মনে হয়,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'তারমানে আরও সিরিয়াস হতে হবে আমাদের, টাকাগুলো বের করতেই হবে। একটা কথা বুঝতে পারছি না, এই রহস্যের মাঝে জিপসিরা ফিট করছে কোথায়? শেরিনার সংগে কথা বললাম আগের দিন, পরের দিন দলবলসহ গায়েব। এরপর দু'জন জিপসি একেবারে ইয়ার্ডে চলে এলো আমার জন্যে সংবাদ নিয়ে। শেরিনাও এখন একটা রহস্যময় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

'তাহলে কি করবো আমরা এখন?' রবিন প্রশ্ন করলো।

'কারমলের বোনের সংগে কথা বলবো,' কিশোর জবাব দিলো। 'লস অ্যাঞ্জেলসে থাকে। হয়তো ফোন গাইডে নাম পাওয়া যাবে।'

গাইডটা বের করে দিলো মুসা।

পাতা ওল্টাতে শুরু করলো কিশোর। মোট চারজন মিসেস লারমার পাওয়া গেল। প্রথম দু'জনকে ফোন করতে জানালো, ডেন কারমলের নামও শোনেনি। তৃতীয় জন এক মুহূর্ত থমকে

থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে জানালো, কারমলকে পাওয়া যাবে না। কারণ, সে মারা গেছে।

থ্যাংক ইউ, বলে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। 'যাক, মিসেস লারমারকে পেলাম। একেই খুঁজছিলাম।'

গাইড বইতে ঠিকানা আছে। হলিউডের পুরনো অঞ্চলে থাকে মহিলা।

'দেরি করা উচিত না,' বললো কিশোর। 'তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা করা দরকার।'

'কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না,' হাত ওল্টালো মুসা। 'কি এমন বলবে আমাদেরকে, যা পুলিশকে বলেনি?'

জানি না। তবে পুকুরে পড়া ব্যাঙদের বেরোনোর চেষ্টা করা উচিত।'

'তো, যাবো কি করে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'অনেক দূর। সাইকেলে পারবো না।'

'দেখি ফোন করে, রোলস রয়েসটা পাওয়া যায় কিনা।'

পাওয়া গেল না। কোম্পানি জানালো, আরেক জায়গায় ভাড়ায় গেছে। শেষে গিয়ে বোরিসকেই অনুরোধ করতে হলো। ইয়ার্ডে কাজ তেমন নেই। কাজেই, অমত করলো না বোরিস। ট্রাক বের করলো।

সুন্দর একটা বাংলোয় থাকে মিসেস লারমার। সামনে পাম গাছ আছে, কলার ঝাড় আছে।

বেল বাজালো কিশোর। দরজা খুলে দিলো হাসিখুশি এক

মধ্যবয়েসী মহিলা। 'ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছো? নাকি টফি চকলেট? সরি, কোনোটাই লাগবে না আমার।'

'না, ম্যাডাম,' কিশোর বললো, 'কিছু বিক্রি করতে আসি নি।...এই যে, আমাদের কার্ড। দেখলেই বুঝবেন।'

অবাক হলো মহিলা। 'তোমরা গোয়েন্দা? বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, পুলিশ চীফের নম্বর দিচ্ছি। ফোন করে জিজ্ঞেস করুন।'

'হুঁম্‌ম্‌। তো কি চাই?'

'সাহায্য,' সত্যি কথাটাই বললো কিশোর। 'একটা বিপদে পড়েছি। আপনার দেয়া তথ্য আমাদের কাজে লাগতে পারে। আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে, ডেন কারমল। লম্বা কাহিনী। ভেতরে আসতে বলবেন না?'

দ্বিধা করলো মহিলা। তারপর পাল্লা সরটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। 'এসো।'

বসার ঘরে সোফায় বসলো ছেলেরা।

ট্রাংক কেনা থেকে শুরু করলো কিশোর। মাঝে মাঝে কিছু কথা বাদ দিলো, যেমন সক্রেটিসের কথা। মরা মানুষের খুলিকে অনেক মহিলাই ভালো চোখে দেখে না।

'তাহলে বুঝতেই পারছেন,' শেষে বললো কিশোর। 'যেহেতু ট্রাংকটা আমরা কিনেছি, ডাকাতেরা ধরেই নেবে, টাকাগুলো রেখে দিয়ে তারপর ট্রাংক বিক্রি করেছি। আমাদের বিপদটা

বুঝতে পারছেন ?'

'পারছি,' মাথা দোলালো মহিলা। 'কিন্তু আমি কি সাহায্য করতে পারি ? টাকার কথা কিচ্ছু জানি না আমি, হাজারবার বলেছি পুলিশকে। আমার ভাই যে এমন একটা কাজ করে বসবে তা-ও কোনোদিন ভাবিনি।'

'পুলিশকে যা যা বলেছেন, আমাদেরকে সেসব কথা বললেই চলবে। হয়তো কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

'বেশ। অনেক আগের ঘটনা, কিন্তু এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে আমার।' বলতে শুরু করলো মহিলা। 'টনি, ও, জানো না বোধহয়, ডেনের ডাক নাম টনি, আঠারো বছর বয়েসে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমার বিয়ে হলো, স্বামীর ঘরে চলে এলাম। তারপর থেকে অনেক দিন পর পর টনির সংগে দেখা হতো আমার। আসতো আমাদের বাড়িতে, কয়েক দিন বেড়াতো। কখনও বলতো না সে কি কাজ করে। আমি বেশি চাপাচাপি করলে দায়সারা জবাব দিতো, কিসের নাকি সেলসম্যান। আর কিছুই বলতো না। এখানে যখন আসতো, আমার স্বামীর কাজে সাহায্য করতো, করতে বোধহয় ভালো লাগতো তার।

'ঘর-বাড়ি মেরামতের কাজ করতো আমার স্বামী। ভালো কাজ জানতো, তাই কাজ পেতোও। টাকা রোজগার করতো প্রচুর। মেরামতের কাজ কি কি জানোই তো ; এই রঙ করা, দেয়ালের কাগজ উঠে গেলে লাগিয়ে দেয়া, মেঝের কাজ, বাথ-রুমের কাজ, সবই জানতো।

'ওই যে বললাম, এসব কাজ টনির পছন্দ ছিলো। তাই বেড়াতে এলে আমার স্বামীর সংগে যেতো, তাকে সাহায্য করতো। এভাবে শিখে ফেলেছিলো অনেক কিছু।

'শেষবার যখন এলো টনি, কেমন যেন অস্থির অস্থির মনে হলো তাকে। ভাবলাম, অনেক দিন দেশ-বিদেশে ঘুরে এসেছে হয়তো, তাই মন চঞ্চল। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়, উচ্চারণ আগের চেয়ে খারাপ। জানো তোমরা, কিভাবে ধরা পড়েছে ও। "এল" অক্ষরটা উচ্চারণ করতে পারতো না। এই যেমন ধরো, ফ্লাওয়ারকে বলতো ফাওয়ার। ব্যাংক ডাকাতি করে যে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছে, কল্পনাও করিনি তখন।

'একটা কথা আছে না, বাইরে কাজের ঘরে অকাজের। আমার স্বামীরও হয়েছিলো ওই দশা। রোজ গাধার খাটুনি খেটে লোকের ঘরদোর মেরামত করে দিয়ে আসতো, অথচ নিজের বাড়ি যে ভেঙেচুরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিলো না।

'শেষবার টনি যখন এলো, আমাদের ঘর মেরামত করে দিলো। আমরা কিছু বলিনি, ইচ্ছে করেই কাজে লাগলো সে। দেয়ালের কাগজ লাগালো, মেঝে ঠিক করলো, রঙ করলো।

'ও থাকতেই আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। অনেক বড় একটা কাজ তখন হাতে। একটা রেস্ট রেন্টকে নতুন করে সাজানো। কাজ বাকি থাকতেই অসুখে পড়লো। তখন টনিকে অনুরোধ করলো, তার কাজটা শেষ করে দিতে।

'রাজি হলো টনি। অদ্ভুত লম্বা এক ওভারঅল পরে, চোখে বড় কালো চশমা লাগিয়ে বেরোতো। অবাকই লাগতো আমার, ওর ওরকম পোশাক দেখে। কিছু বলতাম না। ভাবতাম, ওটা আরেক খেয়াল। তাছাড়া স্বামী তখন অসুস্থ। বেশি ভাবারও সময় ছিলো না। টনি যে কাজটা করে দিচ্ছে, এতেই আমরা খুশি।

'দেখতে দেখতে স্বামীর অসুখ বেড়ে গেল। হাসপাতালে নেয়ার আর সময় পেলাম না। তার আগেই মারা গেল সে।'

ভিজে এলো মিসেস লারমারের চোখ। রুমাল দিয়ে মুছে, কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার বললো, 'ভাবলাম, এরপর আমার কাছেই থেকে যাবে টনি। দুলাভাইয়ের কাজটা নেবে। ভালো ব্যবসা, ভালো আয়, নেবে না কেন? ভুল ভেবেছিলাম। কাজ করা'তো দূরের কথা, আমার স্বামীকে কবর দেয়া পর্যন্তও থাকলো না সে। তাড়াহুড়ো করে ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। অবাক হয়েছিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছি, কেন তাড়াহুড়া করেছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আমার স্বামীর ডেথ নোটিশ। জানোই তো, কেউ মারা গেলে কাগজে ডেথ নোটিশ দিতে হয়। উল্লেখ করতে হয়, মৃত্যুর সময় কে কে সামনে ছিলো। কাগজে তার নাম দেখে যদি পুলিশ এসে হাজির হয়?—এই ভয়ে পালিয়েছিলো সে।

'পুলিশ ঠিকই এসেছিলো। একে স্বামীর মৃত্যু, তার ওপর

ভাইয়ের দুঃসংবাদ, আমার তখন কি অবস্থা হয়েছিলো বোঝো?'

'আচ্ছা, আপনার ভাই চলে যাওয়ার সময় কিছু বলেছিলো? সে ফিরে আসবে, দেখা করবে আপনার সংগে, এমন কিছু?'

'ফিরে আসবে, ঠিক ওভাবে বলেনি। তবে বলেছিলো, বাড়িটা যাতে বিক্রি না করি। তাহলে তার জানা থাকবে আমি কোথায় আছি।'

'আপনি কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, না বাড়ি বেচবো কেন? ইচ্ছে হলেই এসে দেখা করতে পারবে আমার সংগে।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' এক আঙুল তুললো কিশোর। 'আপনার স্বামী যখন কাজে চলে যেতো, আপনি তখন কি করতেন?'

'চাকরিতে যেতাম। বলতে ভুলে গেছি, আমিও চাকরি করতাম একটা।'

'শেষবার যখন আপনার ভাই এলো আপনাদের বাড়িতে, তখনও চাকরিটা করতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি, টাকাগুলো কোথায় লুকানো আছে,' ঘোষণা করলো যেন কিশোর। 'আপনার স্বামী কাজে চলে যেতেন, আপনি আপনার চাকরিতে চলে যেতেন। একা বাড়িতে থাকতো টনি। তারমানে টাকাগুলো এখানেই কোথাও লুকানো আছে, এই বাড়িতেই।'

এগারো

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'কিন্তু ইয়ান ফ্লেচার তো বললেন, বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে,' রবিন বললো, 'টাকাগুলো পাওয়া যায়নি।'

'যারা খুঁজেছে তাদের চেয়ে চালাক ছিলো ডেন কারমল,' বললো কিশোর। 'এমনভাবেই লুকিয়ে ছিলো, যাতে সাধারণ খোঁজাখুঁজিতে চোখে না পড়ে। বড় নোটের বাণ্ডিল করলে পাঁচ লাখ ডলারে তেমন বড় কোনো প্যাকেট হবে না। চিলে-কোঠা, ঘরের হাঁইচ, এরকম অনেক জায়গা আছে, লুকিয়ে রাখা যায়। লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলো ডেন কারমল, পরে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে এসে বের করে নিতো। কিন্তু ফেরত আর আসতে পারলো না বেচারা, জেলেই মারা গেল।'

'ঠিক!' বলে উঠলো রবিন। 'সে-জন্যেই মিসেস লারমারকে জিজ্ঞেস করেছিলো, বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন কিনা।'

'পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে বটে,' মুসাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'কিন্তু কিশোর, আমরা তো এখন টাকাগুলো বের করতে পারি?'

মিসেস লারমারের দিকে চেয়ে বললো কিশোর, 'বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে পারি?'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, বুঝতে পারছি,' বললো মিসেস লারমার। 'কিন্তু এ-বাড়িতে খুঁজে তো লাভ হবে না। এই বাড়িতে থাকতাম না তখন। ওটা চার বছর আগেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। টনিকে যখন বলেছিলাম, তখন বেচার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না। পরে একজন এসে এতো বেশি টাকার অফার দিলো, না বেচলেই বোকামি হতো। তাই সেটা ছেড়ে এটা কিনে এখানে উঠে এসেছি।'

স্পষ্ট হতাশা দেখা গেল কিশোরের চেহারায়। দীর্ঘ এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে আবার বললো, 'তাহলেও ওই বাড়িতেই আছে এখনও টাকাগুলো।'

'হ্যাঁ, তা থাকতে পারে,' মাথা নাড়লো মিসেস লারমার। 'পুলিশ যখন পায়নি, আর কেউ পেয়ে গেছে এতোদিনে, এটাও মনে হয় না। আমরা থাকতাম পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ডানডিল স্ট্রীটে। ওখানে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।'

'থ্যাংক ইউ,' বলে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'মিসেস লারমার, অনেক উপকার করলেন! যতো তাড়াতাড়ি পারি, গিয়ে খুঁজবো ওখানে।'

মহিলাকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

ট্রাকে উঠেই বোরিসকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ড্যান-ভিল স্ট্রীটটা চেনেন?'

লস অ্যাঞ্জেলসের পুরনো একটা ম্যাপ বের করলো বোরিস। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওটার ওপর কিশোর। ড্যানভিল স্ট্রীট আছে ম্যাপে। ছোট একটা গলি।

'বাড়ি যাওয়া দরকার, কিশোর,' বললো বোরিস। 'মিস্টার পাশা দেরি করতে মানা করেছেন।'

'দেরি হবে না,' কিশোর বললো। 'রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাড়িটা একবার দেখে নেবো, ব্যস। অন্যের বাড়িতে ঢুকে তো আর খোঁজাখুঁজি করতে দেবে না। দেখে গিয়ে আমাদের সন্দেহের কথা মিস্টার ফ্লেচারকে জানাবো।'

রবিন আর মুসা জানে, এই কাজটা করতে খুব খারাপ লাগবে কিশোরের—সন্দেহের কথা গিয়ে পুলিশকে জানানো। তার চেয়ে, টাকাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে গিয়ে যদি পুলিশের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারতো, তাদেরকে অবাক করে দিতে পারতো, তাহলে অনেক বেশি খুশি হতো। সেটা এখন আর সম্ভব না।

তর্ক করলো না বোরিস। কিশোর যেখানে যেতে বললো সেখানেই রওনা হলো। অসুবিধে নেই। রকি বীচে ফেরার পথেই পড়বে ড্যানভিল স্ট্রীট।

টাকা পাওয়ার ব্যাপারে আশা বেড়েছে যদিও, সন্দেহ

যাচ্ছে না মুসার। বললো, 'কিশোর, টাকাগুলো ওখানে না-ও তো লুকাতে পারে কারমল।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, ওখানেই লুকিয়েছে। ডেন কারমলের জায়গায় আমি হলে ওখানেই লুকাতাম।'

অনেকগুলো অলিগলি পেরিয়ে, মোড় নিয়ে ড্যানভিল স্ট্রীটে এসে পড়লো গাড়ি।

'এটা নয়শো নম্বর ব্লক,' বললো কিশোর। 'বোরিস, বাঁয়ে মোড় নিন। পাঁচশো নম্বরটা ওদিকেই হবে।'

মোড় নিলো বোরিস।

উৎসুক হয়ে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর নম্বর পড়ছে তিন কিশোর।

'আটশো,' বললো রবিন। 'আরও তিনটে ব্লক পেরোলে, তারপর।'

আরও কিছু বাড়ি পেরিয়ে এলো ট্রাক।

নম্বর দেখার জন্যে বকের মতো গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ছেলেরা।

'পরের ব্লকটাই হবে,' আবার বললো রবিন। 'বোধহয় ডানে।'

'পরের ব্লকের মাঝামাঝি থামবেন,' বোরিসকে বললো কিশোর।

'হোকে।'

মিনিটখানেক পরে থামলো ট্রাক।

ডানে, বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, পুরো ব্লকটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে। ধারেকাছে ছোট বাড়ি একটাও নেই।

বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

'পাঁচশো বত্রিশ নম্বর গেছে!' হতাশ হয়ে বললো রবিন। 'ওটার জায়গায়ই ওই বাড়ি তুলেছে। একটাই নম্বর, পাঁচশো দশ।'

'তারমানে পাঁচশো বত্রিশ নম্বরটা হারালাম,' মুসার কণ্ঠেও নিরাশা।

'পরের ব্লকটায় গিয়ে দেখুন তো, বোরিস,' কিশোর বললো। 'হয়তো ওটাতে আছে।'

কিন্তু পরের ব্লকটা চারশো নম্বর। পাঁচশো বত্রিশ নেই। ট্রাক থামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালো বোরিস।

'মিসেস লারমার কি মিথ্যে বললো?' রবিনের প্রশ্ন। 'পাঁচশো বত্রিশ নম্বরে হয়তো থাকেইনি কোনোদিন। হয়তো এখন ও-বাড়িতে আছে, সেখানেই ছিলো বরাবর। ফাঁকি দিয়ে আমাদের বিদেয় করে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে টাকাগুলো। পাঁচ লাখ ডলার, সোজা কথা না।'

'না,' কিশোর বললো, 'আমার মনে হয় না মিথ্যে বলেছে। আসলে, পাঁচশো বত্রিশেরই কিছু হয়েছে। তোমরা এখানে বসো। আমি চট করে গিয়ে দেখে আসি।'

ট্রাক থেকে নেমে চলে গেল সে। ফিরে এলো কয়েক মিনিট পরেই। জানালো, 'অ্যাপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্টের সংগে

কথা বলে এলাম। বললো, পাঁচশো বত্রিশ নম্বর নাকি ছিলো ওখানে। আরও কয়েকটা ছোট বাড়ি। মোট ছয়টা। ওগুলোকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা তৈরি হয়েছে, বছর চারেক আগে।

সরিয়ে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'সরায় কিভাবে? কোথায়?'

'ম্যাপল স্ট্রীটে। এখান থেকে তিন ব্লক দূরে, এই পথের সমান্তরাল আরেকটা পথ। বাড়িগুলোর কণ্ডিশন ভালো ছিলো, বেশি বড়ও না, তাই না ভেঙে তুলে নিয়ে গিয়ে নতুন ভিতের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মিসেস লারমারের বাড়িটাও আছে, শুধু জায়গা বদল করেছে।'

'কাণ্ড আরকি,' বললো রবিন। 'বাড়িরাও বেড়ায় আজকাল, জায়গা বদলায়। খুঁজে বের করবো কি করে? নম্বর তো নিশ্চয় এখন আর পাঁচশো বত্রিশ নেই।'

'বাড়িটা দেখতে কেমন, ফোনে জিজ্ঞেস করবো মিসেস লারমারকে,' কিশোর বললো। 'তারপর ম্যাপল স্ট্রীটে গিয়ে খুঁজে বের করবো।'

'আজ তো আর হবে না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'না, আজ আর হবে না। দেখি, কাল আসার চেষ্টা করবো। বোরিস, বাড়ি যান।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালো বোরিস। মোড় পেরোতেই তাদের পিছু নিলো কালো একটা বড় গাড়ি। তাতে তিনজন আরোহী। ব্লকখানেক দূরে থেকে ট্রাকটাকে অনুসরণ

করে চললো। তিন গোয়েন্দা, কিংবা বোরিস এর কিছুই জানলো না।

ইয়ার্ডে ফিরে দেখলো বন্ধ করি করি করছেন রাশেদ পাশা। ওদের জন্যেই বসে আছেন।

'এতো দেরি করলে কেন?' রাগ করে বললেন তিনি।

'ইয়ে, একটা জরুরী কাজ···,' থেমে গেল কিশোর।

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন রাশেদ পাশা। 'তোমার নামে একটা প্যাকেট এসেছে। কাউকে কোনো কিছুর জন্যে লিখেছিলে নাকি?'

'কই, না তো! কী?'

'দেখো গিয়ে, অফিসের দরজার কাছে রেখে দিয়েছি। বড় বাক্স। খুলিনি।'

শক্ত কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। খোলা জায়গাগুলোতে অ্যাডেসিভ টেপ লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ডাকে এসেছে। প্রেরকের নাম নেই।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা! 'আছে কি এর মধ্যে?'

'খুললেই বোঝা যাবে,' কিশোরও অবাক হয়েছে। 'ধরো তো, ওয়ার্কশপে নিয়ে যাই।'

যথেষ্ট ভারি। ধরাধরি করে বাক্সটা ওয়ার্কশপে নিয়ে এলো ওরা।

ছুরি দিয়ে টেপ কাটলো কিশোর। বাক্সের ডালা তুলেই তাজ্জব হয়ে গেল।

বিশ্বাস

'আল্লাহ্‌রে, আবার!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

কিছুক্ষণ কিশোরও কথা বলতে পারলো না। 'ডে-ডেটলারের ট্রাংক! কে পাঠালো?' অবশেষে বললো সে।

তাদেরকে আরও অবাক করে দেয়ার জন্যেই যেন বলে উঠলো একটা চাপা কণ্ঠ, 'জলদি!···সূত্র খুঁজে বের করো!'

সক্রেটিস! ট্রাংকের ভেতর থেকে কথা বলছে।

বারো

'তাহলে, এবার কি করা?' বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

শনিবার। বাক্সটা যেদিন পেয়েছে তার পরের দিন বিকেলে ওয়ার্কশপে' বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। আগের দিন এতোই উত্তেজিত আর ক্লান্ত ছিলো, ট্রাংকটা খুলে দেখতেও আর ইচ্ছে হয়নি। ছাপার মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে ওটা।

শনিবারেও একেকজনের একেক কাজ ছিলো। সকালে লাইব্রেরিতে ডিউটি ছিলো রবিনের। মুসা তাদের বাড়ির লন পরিষ্কার করেছে। কিশোর ব্যস্ত থেকেছে ইয়ার্ডে। যার যার কাজ শেষ করে এখন মিলিত হয়েছে তিনজনে।

'আমি বলি কি,' রবিন বললো, 'এটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসি মিস্টার ফ্লেচারকে। যা যা জানি আমরা বলে আসি। এরপর পুলিশ যা করার করুক।'

ঠিকই বলেছো। তা-ই করা উচিত,' সমর্থন করলো মুসা। 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'সেটা করতে পারলেই ভালো হতো,' ধীরে ধীরে বললো কিশোর। 'কিন্তু কি বলবো? কি জানি আমরা? ডেন কারমল তার বোনের বাড়িতে টাকা লুকিয়ে রেখেছে, এটা আমাদের সন্দেহ। শিওর না। এই সন্দেহ তো পুলিশও করেছিলো।'

'তা করেছিলো। জায়গামতো খোঁজেনি, তাই পায়নি,' বললো রবিন। 'তবে ওই বাড়িতেই রেখেছে ডেন কারমল। ল্যান ফ্রানসিসকোর ব্যাংক থেকে টাকা যেদিন লুট করেছে, সেদিনই গিয়ে বোনের বাড়িতে উঠেছে। তারমানে তখনও টাকাগুলো তার সংগেই ছিলো। কমাল ধরা পড়লে শাস্তি অনেক বেশি হবে, টাকাগুলোও খোয়া যাবে, তাই ওগুলো ওই বাড়িতেই লুকিয়ে ফেলেছে। জেল খেটে বেরিয়ে এসে বের করে নিতো। কপাল খারাপ বেচারার, মরে গেল তার আগেই।'

'আর যদি,' মুসা বললো, 'সে ওই বাড়িতে টাকাগুলো নাই রেখে থাকে, তাহলে তো গেলই। ওই টাকা খুঁজে বের করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

'গতকাল আমাদের সংগে কথা বলেছিলো সক্রেটিস,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর।

'তা তো বলেছে!' কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ। 'বিশ্বাস করো, শুনতে একটুও ভাল্লাগেনি আমার।'

'হ্যাঁ, স্বরটাই জানি কেমন!' বললো রবিন।

'কিন্তু কথা তো বলেছে,' বললো কিশোর। 'কিভাবে বলেছে, এই মুহূর্তে আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। ও আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সূত্র খুঁজে বের করতে বলেছে। তার-মানে ট্রাংকে নিশ্চয় সূত্র আছে, আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'সেজন্যেই তো বললাম, ফ্লেচারের কাছে পাঠিয়ে দাও,' মুসা বললো। 'ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুক পুলিশ। তবে তার দরকারই হয়তো হবে না। ম্যাপল স্ট্রীটে গিয়ে বাড়িটাতে খুঁজলেই টাকাগুলো পেয়ে যাবে। আর পুলিশের টাকা পাওয়া নিয়েই কথা।'

'তা ঠিক,' সায় জানালো কিশোর। 'তাহলে এখন মিসেস লারমারকে ফোন করতে হয়। বাড়িটার ডেসক্রিপশন জেনে নিয়ে পুলিশকে জানাবো।'

'তাহলে করো। চলো হেডকোয়ার্টারে যাই।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা।

মিসেস লারমারকে ফোন করলো কিশোর।

'বাড়িটা?' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল অবাক হয়েছে মহিলা। 'ওটা আবার বলা লাগে নাকি? ড্যানভিল স্ট্রীটে যাও না, গেলেই দেখতে পাবে।'

গিয়েছিলো, জানালো কিশোর। কি কি দেখে এসেছে, তাও বললো।

'অ্যাপার্টমেন্ট হাউস! ও, এই জন্যেই এতো টাকা দিয়ে কিনেছে লোকটা। আগে জানলে আরও বেশি দাম চাইতাম।

এখন মনে হচ্ছে কমেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যাকগে, যা হবার হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা ছিলো বাংলো-টাইপ, বাদামী রঙের কাঠের বেড়া। একতলা। তবে ছোট একটা চিলেকোঠা ছিলো, তাতে গোল একটা জানালা, সামনের দিকে।'

'থ্যাংক ইউ,' বললো কিশোর। 'পুলিশকে বলবো। খুঁজে বের করে ফেলবে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকালো সে। 'যতোই ভাবছি, বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে আমার, ওই বাড়িতেই আছে টাকা-গুলো। এবং ট্রাংকের মধ্যেই আছে কোনো সূত্র।'

'থাকলে থাকুক,' হাত নাড়লো মুসা, 'আমি আর এসবে নেই। হ্যামলিনের কি অবস্থা তো দেখলে। ট্রাংকটা আর ছুঁয়েও দেখার দরকার নেই আমাদের। সোজা পাঠিয়ে দিই পুলিশের কাছে।'

'বেশ। তাহলে মিস্টার ফ্লেচারকে ফোন করে বলি যে আমরা আসছি।'

আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করলো কিশোর।

সাড়া এলো ওপাশ থেকে, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার। লেফ-টেন্যান্ট বেকার বলছি।' কর্কশ, অপরিচিত কণ্ঠ।

'আমি কিশোর পাশা বলছি। চীফের সংগে কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

'চীফ নেই,' কাটা কাটা কথা। 'কালকের আগে ফিরবে না। তখন চেষ্টা করো।'

'কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী। আমরা একটা সূত্র পেয়েছি···'

'দেখো, আমি এখন খুব ব্যস্ত। বকবকের সময় নেই।'

'কিন্তু চীফ আমাকে বলেছেন···'

'কাল,' ওপাশ থেকে কেটে দেয়া হলো লাইন।

আস্তে করে রিসিভার রেখে শূন্য চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান।

'ব্যাটা নতুন এসেছে মনে হয়,' বললো মুসা।

'চেনে না আমাদের,' যোগ করলো রবিন।

'ওই বড়দের মতোই ব্যবহার,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। 'ওদের ধারণা, যেহেতু আমরা ছোট, ভালো কোনো আইডিয়া আমাদের মাথায় আসতে নেই। কিন্তু কালও তো ট্রাংকটা নিয়ে যেতে পারবো না। রোববার। বন্ধ। যেতে যেতে সোম বারে। তাই আমি বলি কি, হাতের কাছেই যখন আছে সময়ও আছে প্রচুর, ট্রাংকটা আরেকবার ঘাঁটতে দোষ কি?'

'আমি নেই,' দুই হাত নাড়লো মুসা। 'সক্রেটিসকে দেখলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কথা বললে তো আরও বেশি।'

'মেরিচাচীও দেখতে পারেন না,' রবিন বললো। 'তাঁর সংগেও ফাজলামি করেছে।'

'তা করেছে। তবুও ট্রাংকটা খুলে দেখতে তো কোনো অসুবিধে নেই। কোনো জিনিস রেখে তারপর ফেরত পাঠিয়েছে কিনা কে জানে।'

ওয়ার্কশপ থেকে আবার বেরিয়ে এলো ওরা।

ছাপার মেশিনের ওপাশ থেকে ট্রাংকটা বের করে আনলো।

ভেতরে আগের মতোই সাজানো আছে জিনিসগুলো। এক কোণে কাপড়ে মোড়ানো রয়েছে সক্রেটিস। লাইনিঙের ছেঁড়ার মধ্যে রয়েছে চিঠিটা।

সক্রেটিসকে তুলে কাপড়ের মোড়ক খুললো কিশোর। ছাপার মেশিনের ওপর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা রেখে তার ওপর রাখলো খুলিটা। তারপর চিঠিটা বের করলো। 'দেখি আরেকবার খুলে,' আনমনে বললো।

কয়েকবার করে পড়লো তিনজনে। আগের মতোই লাগলো, অতি সাধারণ একটা চিঠি।

'নাহ্, সূত্র থাকলেও বোঝা যাচ্ছে না,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'আরে···রাখো রাখো। পেয়েছি!' রবিনের হাত থেকে চিঠি আর খামটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললো, 'কি মিস করেছি বুঝেছো?'

'কী!' রবিন অবাক। 'আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'খামের স্ট্যাম্প! স্ট্যাম্পের নিচে দেখা হয়নি!'

স্ট্যাম্প দুটোর দিকে তাকালো রবিন। একটা দুই সেন্টের, আরেকটা চার সেন্ট। কিশোরের হাত থেকে খামটা আবার নিয়ে স্ট্যাম্পগুলোর ওপর আঙুল বোলালো। 'কিশোর,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ঠিকই বলেছো। একটার নিচে কি যেন আছে। উঁচু মনে হচ্ছে এই চার সেন্টেরটা।'

মুসাও আঙুল বুলিয়ে দেখে মাথা ঝোঁকালো।

একটা স্ট্যাম্পের চেয়ে আরেকটা উঁচু, পার্থক্যটা এতো সামান্য, খুব ভালোমতো খেয়াল না করলে বোঝা যায় না।

'হেডকোয়ার্টারে চলো,' রবিন বললো। 'খুলে দেখি।'

তাড়াহুড়ো করে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলো ওরা। তিন মিনিটের মাথায় কেটলির পানি ফুটতে আরম্ভ করলো। নলের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছে। তার ওপর স্ট্যাম্পগুলো ধরলো কিশোর। বাষ্পে ভিজে আস্তে আস্তে নরম হয়ে এলো আঠা।

খুব সাবধানে চার সেন্টের স্ট্যাম্পটা তুললো কিশোর। তুলেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখো দেখো, নিচে আরেকটা।'

এক সেন্টের একটা সবুজ স্ট্যাম্প।

'আশ্চর্য!' ভ্রূকুটি করলো রবিন। 'কি মানে এর?'

'খুব সহজ।' মুসা ব্যাখ্যা দিলো, 'এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই। খামটা আগের, যখন ডাকের রেট কম ছিলো। তখন এক সেন্টের স্ট্যাম্প লাগানো ছিল ওটাতে। কারমল যখন চিঠিটা পোস্ট করলো, রেট তখন বেড়ে গেছে। ফলে ওটার ওপরই চার সেন্টের আরেকটা লাগিয়ে দিয়েছে সে। পাশে তিন সেন্টের একটা লাগালেই যে চলতো, এটা খেয়াল করেনি। কিংবা হয়তো তিন সেন্টের স্ট্যাম্প তখন পায়নি।'

'ঠিক। কিশোর, মুসা ঠিকই বলেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' সবুজ স্ট্যাম্পটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। তারপর খুব সাবধানে আস্তে

করে তুলে আনলো ওটা। নিচে লেখা-টেখা আছে কিনা দেখার জন্যে।

'নেই,' দেখে বললো রবিন। তৃতীয় স্ট্যাম্পটাও তুললো। 'এটাতেও নেই। এবার কি বলবে, কিশোর?'

'আর যা-ই হোক, মুসার যুক্তি মানতে পারছি না। কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে।'

'কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ভাবছি।' চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'কারমল জানতো, এই চিঠি সেনসর হবেই। তাই, স্ট্যাম্পের সাহায্যেই মেসেজ পাঠিয়েছে। একটার ওপর আরেকটা স্ট্যাম্প এমনভাবে লাগিয়েছে, যাতে সহজে বোঝা না যায়। ও আশা করেছে, ভালোমতো খামটা পরীক্ষা করবে ডেটলার, বুঝতে পারবে। এক সেন্টের স্ট্যাম্পটার রঙ সবুজ, তারমানে তার লুকানো টাকাগুলোর রঙও সবুজ। কারমল বোঝাতে চেয়েছে...'

'বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'স্ট্যাম্প কাগজে তৈরি। টাকাও কাগজের। কাগজের ওপর কাগজ রেখে সে বোঝাতে চেয়েছে টাকাগুলো কোনো ধরনের কাগজের তলায় লুকিয়েছে। মিসেস লারমার বলেছে, ইচ্ছে করেই তাদের বাড়ি মেরামত করেছে তার ভাই। ঘরের দেয়ালের ছেঁড়া কাগজ নতুন করে লাগিয়েছে। কারমল করেছে কি, নোটগুলোকে পাশাপাশি আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটা আস্ত কাগজ বানিয়েছে, কিংবা ছোট ছোট কয়েকটাও হতে পারে। ওগুলো দেয়ালে লাগিয়ে তার

ওপর কাগজ সাঁটিয়ে দিয়েছে।'

'খাইছে!' মাথা দোলালো মুসা। 'রবিন, ঠিকই বলেছো। তাই করেছে। ঠিক না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ। একটা গল্প মনে পড়ছে। গোয়েন্দা গল্প। চোর অনেকগুলো সোনার বারকে পিটিয়ে পাতলা করে চাদর বানিয়েছে। তারপর ওই চাদর পেরেক দিয়ে কাঠের দেয়ালে লাগিয়ে তার ওপর কাগজটা সেঁটে দিয়েছে। ওই একই কাজ করেছে কারমলও। গল্পের চোর লুকিয়েছিলো সোনা, আর আমাদের চোর, টাকা।'

'কিন্তু,' মনে করিয়ে দিলো রবিন, 'মিসেস লারমার আরও একটা কথা বলেছে। মিস্টার লারমার অসুখে পড়লে তার হয়ে রেস্টুরেন্টের কাজ করে দিয়ে এসেছিল কারমল। ওই বাড়িতে টাকাগুলো লুকায়নি তো?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'সব চেয়ে ভালো জায়গা...আরি আরি আরি!'

'আরি আরি কি?' ভুরু নাচালো মুসা। 'এতগুলো আরি কেন?'

'কারমল বলেছে! চিঠিতে বলেছে ডেটলারকে। দেখো,' চিঠিটা দুই সহকারীর দিকে বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'দেখো, কি লিখেছে? "পাঁচ দিনও হতে পারে, তিন হপ্তা, কিংবা হয়তো দু' মাস।" নম্বরগুলোকে পাশাপাশি রেখে এক অংকে সাজাও। কি হয়? পাঁচশো বত্রিশ!'

'মিসেস লারমারের বাড়ির নম্বর!' টেবিলে চাপড় মারলো রবিন। 'পাঁচশো বত্রিশ ড্যানভিল স্ট্রীট।'

'ঠিক,' বললো কিশোর। 'আর এই যে লিখেছে, কখনও যদি শিকাগোয় যাও, আমার মামাতো ভাই ড্যানি স্ট্রীটের সংগে দেখা করো।'

'ড্যানভিলের ডাক নাম ড্যানি হতে পারে,' বলে উঠলো মুসা। 'অনেক রাস্তারই ডাক নাম আছে।'

'কাগজের নিচে টাকা লুকানো!' রবিন বললো। 'চিঠিতে কোনোভাবে বলতে সাহস করেনি। স্ট্যাম্পের ওপর স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে। দারুণ বুদ্ধি!'

'হ্যাঁ!' কিশোর বললো। 'ওই মামাতো ভাই আর শিকাগোর কথা লিখেছে ড্যানি স্ট্রীট থেকে নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'হুঁ। ধাঁধার সমাধান তো হলো। এখন টাকাগুলো কিভাবে বের করা যায়?'

'সমস্যাই,' রবিন বললো। 'হুট করে গিয়ে তো আর কারও ঘরে ঢুকে বলতে পারি না, আপনার দেয়ালের কাগজ ছিঁড়তে চাই।'

'না, পারি না,' কিশোর বললো। 'সেটা পুলিশের কাজ। লেফটেন্যান্ট বেকারকে বলা বেকার, চীফকে বলতে হবে। তারমানে সোমবার, চীফ যখন অফিসে থাকবেন...'

বেজে উঠলো টেলিফোন।

রিসিভার তুলে নিলো কিশোর। 'তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।'

'গুড!' কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠ। 'আমি নরম্যান হল।'

'নরম্যান হল?' নামটা কিশোরের অপরিচিত।

'হ্যাঁ। চীফ ফ্লেচার নিশ্চয় আমার কথা বলেছে তোমাদের-কে। বলেনি?'

'না তো!'

'হয়তো ভুলে গেছে। চীফই আমাকে তোমাদের নম্বর দিয়েছে। ব্যাংকারস প্রোটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনের একজন স্পেশাল এজেন্ট আমি। ট্রাংকটা কিনেছো তোমরা, খবরের কাগজে একথা পড়ার পর থেকেই তোমাদের ওপর চোখ রেখেছি। আর...'

'বলুন?'

'আরও তিনজন রাখছে। দিন রাত। ক্যালিফোর্নিয়ার তিনজন ভয়ানক খুনে ডাকাত।'

তেরো

'আ-আমাদের ওপর নজর রাখছে?' কেঁপে গেল কিশোরের কণ্ঠ।

ঢোক গিললো রবিন আর মুসা।

'নিশ্চয়। চোখ রাখছে। যেখানে যাচ্ছো, পিছেপিছে যাচ্ছে। ওদের নাম ড্রেক, ওরফে তিন-আঙুলে, নরিস, ওরফে আলু-মুখো, আর ট্যানটন, ওরফে ছুরি। ডেন কারমলের সংগেই জেল খেটেছে। ওদের ধারণা, টাকাগুলো খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা।'

'কিন্তু...কিন্তু আমরা তো কাউকে দেখিনি। মানে, সন্দেহ-জনক...'

'ওরা প্রফেশনাল। বাঘা বাঘা পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে দেয়, আর তোমরা তো ওদের কাছে শিশু। তোমাদের ইয়ার্ডের কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া করেছে, পথের ভাটিতে। ফিল্ড গ্লাস দিয়ে সারাক্ষণ চোখ রাখছে তোমাদের ওপর। যেখানেই যাচ্ছো,

পিছু নিচ্ছে।'

'তাহলে তো এখুনি পুলিশকে জানানো দরকার,' বললো কিশোর।

স্পীকারে সব কথা শুনছে রবিন আর মুসা, কিশোরের সংগে একমত হয়ে ওরাও মাথা ঝাঁকালো।

'চীফকে জানিয়েছি আমি,' বললো হল। 'কিন্তু চীফ বললো, ওদেরকে ধরা যাবে না এখন। কারও ওপর চোখ রাখা বে-আইনী নয়। বেআইনী কিছু যতোক্ষণ না করছে, ধরা সম্ভব হবে না।'

'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, আমরা টাকাগুলো বের করতে গেলেই ওরাও পিছে যাবে। এইতো?'

'হ্যাঁ। কাজেই তোমাদের যাওয়া উচিত হবে না। কিছু জেনে থাকলে পুলিশকে গিয়ে জানাও।'

'আমরা কিছু জানি না।'

'কিছুই জানো না?'

'কিছুই জানি না, তা নয়। এই মাত্র একটা সূত্র আবিষ্কার করলাম।'

'তাই নাকি? ভেরি গুড। এখুনি গিয়ে চীফকে জানাও। আমিও ওখানে···ওহহো, চীফকে তো পাবে না। এখন মনে পড়লো, বলেছিলো আজ শহরের বাইরে যাবে।'

'হ্যাঁ, জানি। একটু আগে ফোন করেছিলাম। লেফটেন্যান্ট বেকার জানালো, চীফ নেই। লেফটেন্যান্ট তো আমাদের কথাই

শুনতে রাজি না।'

'আর এখন যদি গিয়ে তাকে বলোও, বিশ্বাস করাতে পারো, তাহলেও তোমাদের কোনো লাভ হবে না। সব ক্রেডিট নিজে নিয়ে নেবে। পুরস্কারের লোভে।'

'পুরস্কার?'

'হ্যাঁ। অ্যাসোসিয়েশন একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। চোরাই পাঁচ লাখ ডলার যে উদ্ধার করে দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার ডলার দেয়া হবে।'

'দশ হাজার!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'কিশোর, জলদি জিজ্ঞেস করো, কিভাবে পাওয়া যাবে।'

মুসার কথা শুনতে গেয়েই বোধহয় বললো হল, 'আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি। তোমরা যা জানো, অ্যাসোসিয়েশনকে জানাও, অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের নাম করে পুলিশকে জানাবে। তখন টাকাগুলো পুলিশ খুঁজে বের করলেও পুরস্কারটা পাবে তোমরা। ঠিক আছে, আমি আসছি, তোমাদের সংগে দেখা করবো···নাহ্, সেটা বোধহয় উচিত হবে না। ডাকাতগুলো চোখ রাখছে। আমাকে চেনে ওরা, দেখলেই সন্দেহ করবে। তার চেয়ে তোমরাই বরং আমার এখানে চলে এসো। গোপনে দেখা হবে।'

'ইয়ার্ড ছেড়ে আমি যেতে পারছি না,' বললো কিশোর। 'চাচা-চাচী বাইরে গেছেন। দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন না।'

'হুঁমম্,' এক মুহূর্ত নিরব রইলো হল। তারপর বললো।

'আজ সন্ধ্যায় আসতে পারবে ? ইয়ার্ড বন্ধ করার পর ? তোমরা তিনজনেই আসতে পারো। তবে এমনভাবে বেরোবে, যাতে ডাকাতগুলো দেখতে না পায়। ওদের চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে বেরোতে হবে তোমাদের।'

'হয়তো পারবো। একটু পরেই রবিন আর মুসা বাড়ি যাবে, খেতে। আপনার কি মনে হয় ? ডাকাতেরা ওদের পিছু নেবে ?'

'মনে হয় না। ওদের চোখ তোমার ওপর। কাজেই গোপনে তোমাকেই শুধু বেরোতে হবে। পারবে ?'

'পারবো,' লাল কুকুর চার-এর কথা ভাবলো কিশোর, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনোর আরেকটা গোপন পথ ওটা। 'তবে বেরোতে বেরোতে দেরি হবে। আজ শনিবার তো, সাতটার আগে বন্ধ করতে পারবো না।'

'ঠিক আছে। আটটা তাহলে ?'

'আচ্ছা।'

'কোথায় দেখা হবে ? ওশনভিউ পার্ক ? ওখানেই থাকবো আমি। পুবের গেটের কাছে, বেঞ্চে, খবরের কাগজ পড়ার ভান করবো। গায়ে থাকবে বাদামী স্পোর্টস জ্যাকেট, মাথায় বাদামী হ্যাট। হুঁশিয়ার। পেছনে চোখ রেখো। কেউ যেন অনুসরণ করতে না পারে। ক্লিয়ার ?'

'য়্যাঁ, স্যার।'

'যা যা বললাম, শুধু তোমরা তিনজনেই জানবে। ঘুনাক্ষরেও যেন আর কেউ কিছু না জানে।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে সন্ধ্যা আটটায় দেখা হবে। গুড-বাই।'

লাইন কেটে গেল।

'আরিব্বাপরে !' বললো মুসা। 'কিশোর, দশ হাজার ডলার দিয়ে কি কি করতে পারবো ?'

'টাকাটা পাইনি আমরা এখনও,' জবাব দিলো কিশোর।

'পাইনি। কিন্তু পাবো তো। মিস্টার হল আমাদের কথা অ্যাসোসিয়েশনকে জানাবে, পুলিশকে জানাবে। এমনও হতে পারে, আমাদেরকে সংগে নিয়েই টাকা বের করতে যাবে পুলিশ।'

'হ্বী না,' হাত নাড়লো রবিন। 'লেফটেন্যান্ট বেকার হলে নেবে না।'

'ইস্, মিস্টার ফ্লেচার যে কেন আজ বাইরে গেলেন,' আফসোস করলো কিশোর। 'উনি থাকলে···। আচ্ছা, মিস্টার হলের কথা তিনি আমাদেরকে···'

'কিশোর !' বোরিসের ডাক শোনা গেল। 'একজন কাস্টোমার। একশো ডলারের ভাঙতি চায়।'

'আমি যাই,' দুই সহকারীকে বললো কিশোর। 'এক কাজ করো। ট্রাংকটা গুছিয়ে ফেলো। সক্রেটিসকে ভরবে না, আলাদা রাখবে।'

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলো রবিন। 'হায় হায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে ! লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ছিলো।

মনেই নেই।'

'ঠিক আছে, তুমিও যাও,' মুসা বললো। 'আমি একাই গোছাতে পারবো।'

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো তিনজনে।

কিশোর আর রবিন বেরিয়ে একজন চললো অফিসের দিকে, আরেকজন সাইকেল নিয়ে লাইব্রেরিতে।

ওয়ার্কশপে রয়ে গেছে মুসা। সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে সক্রেটিসের দিকে চেয়ে বললো, 'তারপর, খুলির বাচ্চা, আছো কেমন? খবরদার, আমার সংগে কথা বলার চেষ্টা করো না। তাহলে কবর দিয়ে দেবো জঞ্জালের তলায়।'

নিরব রইলো সক্রেটিস। মুখে সেই একই হাসি।

চোদ্দ

নতুন তথ্য জেনেছে রবিন। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে ছুটে চলেছে ওশনভিউ পার্কে, বন্ধুদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে যেন আর তর সইছে না। দেরিতে পৌঁছেছিলো লাইব্রেরিতে, তাই কাজ সেরে বেরোতেও দেরি হয়ে গেছে। ইয়ার্ডে গিয়ে এখন আর কিশোরকে পাওয়া যাবে না, মুসার বাড়িতে গিয়ে মুসাকেও না। কাজেই পার্কে মিস্টার হলের সংগে যেখানে দেখা করার কথা সেখানেই চলেছে এখন সে।

গেটের কাছে পৌঁছেই ওদের দেখতে পেলো রবিন।

বেঞ্চে বসে দামী পোশাক পরা এক তরুণের সংগে কথা বলছে কিশোর আর মুসা।

সাইকেলের কড়া ব্রেক কষার শব্দে তিনজনেই মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

'সরি, দেরি হয়ে গেল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রবিন।

সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে এসে বসলো বেঞ্চে।

'তুমি নিশ্চয় রবিন মিলফোর্ড,' বললো লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিলো, 'আমি নরম্যান হল।' মানিব্যাগ বের করে খুলে তার আইডেনটিটি কার্ডও দেখালো। সে যে সত্যই নরম্যান হল সেটা প্রমাণ করার জন্যে।

'কিশোর···,' শুরু করতে যাচ্ছিলো রবিন। কিন্তু তার আগে বলে উঠলো কিশোর, 'রবিন, মিস্টার হলকে বলছিলাম মিসেস লারমারের বাড়িতে আছে টাকাগুলো। দেয়ালের কাগজের তলায় লুকানো।'

'ভালো কাজ দেখিয়েছো তোমরা,' প্রশংসা করে বললো হল। 'অ্যাসোসিয়েশন খুশি হবে। কিন্তু এখন কথা হলো, টাকাগুলো বের করা যায় কিভাবে? বাড়িতে লোক আছে নিশ্চয়। তাদেরকে···'

তথ্যটা আর চেপে রাখতে পারলো না রবিন। 'বাড়িতে লোক নেই, মিস্টার হল। তাদেরকে সরাতেও হবে না। বাড়িটাও আর বাড়ি থাকছে না বেশিক্ষণ। এতোক্ষণ আছে কিনা, তাই বা কে জানে?'

বিস্মিত হয়ে তাকালো অন্য তিনজন।

'লাইব্রেরিতে শুনলাম, লাইব্রেরিয়ানের সংগে ম্যাপল স্ট্রীটের কথা আলোচনা করছে এক মহিলা। নামটা শুনেই কৌতূহল হলো। একটা ছুতো করে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। মহিলা বলছে, নতুন বাড়ি খুঁজছে সে। ম্যাপল স্ট্রীটে ছিলো, বের করে

দেয়া হয়েছে ওখান থেকে। আপাতত রকি বীচে কোনোরকম একটা বাড়ি খুঁজে নিয়ে তাতে উঠেছে, পরে ভালো জায়গা খুঁজে নেবে। লাইব্রেরিয়ান বললেন, ম্যাপল স্ট্রীটের বাড়ি ভাঙার খবরটা তিনিও পড়েছেন কাগজে।

'মহিলা চলে যেতেই লাইব্রেরিয়ানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাগজে পড়েছেন। বললেন। খুঁজে বের করলাম কাগজটা। এই যে,' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো রবিন, 'খবরটা ফটো কপি করে নিয়ে এসেছি।'

দ্রুত কাগজের ভাঁজ খুলে জোরে জোরে পড়লো কিশোর :

পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে ;
নতুন রাস্তা তৈরি হবে

তিনশোরও বেশি বাড়ি খালি করা হয়েছে। নির্জন, পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে বাড়িগুলো, বুলডোজারের অপেক্ষায়। যে কোনো সময় ভাঙা শুরু হতে পারে। ওখানে রাস্তা হবে। বাড়ি-ঘরের কোনো চিহ্নই আর থাকবে না। এতোদিন যারা ওখানে বাস করেছে, তাদের কাছে শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে ওগুলো। কোনো অলস মুহূর্তে ওদেরই কেউ হয়তো ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আহা, কি সুন্দরই না ছিলো আমার বাড়িটা।

পনেরো ব্লক লম্বা ম্যাপল স্ট্রীট, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। সেখানে তৈরি হবে সিক্স-লেন ফ্রীওয়ে। লস অ্যাঞ্জেলসের ওই এলাকায় ট্র্যাফিক লোড কমানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শুধু ম্যাপল স্ট্রীটই নয়, আশপাশের

আরও কিছু বাড়িঘরের ক্ষতি হবে, খেয়ে নেবে রাক্ষুসে সড়ক।

বাসিন্দাদের মনের অবস্থা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি করা যাবে? নতুনকে ঠাঁই দেয়ার জন্যে এমনি করেই জায়গা ছেড়ে দিতে হয় পুরনোকে। শোনা যাচ্ছে, শহরের আরও অনেক পুরনো এলাকাও শিগগিরই দখল করে নেবে সরকার, রাস্তা বানানোর জন্যে।

আরও অনেক কিছু লেখা আছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত পড়েই থামলো কিশোর।

'ম্যাপল স্ট্রীট!' বিড়বিড় করলো হল। 'বাড়িঘরগুলো এখন শূন্য। লোক নেই। তাহলে তো আর দেরি করা যায় না। তিন-আঙুলেরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে কিনা কে জানে।'

'ওরা কিভাবে জানবে, মিস্টার হল?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

'গতকাল তোমাদেরকে অনুসরণ করেছিলো। তোমরা ড্যানভিল স্ট্রীটে গেছো, মিসেস লারমারের বাড়িটা খুঁজেছো। অ্যাপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্টের কাছ থেকে জেনে নিতে অসুবিধে হবে না ওদের। ঠিক কোথায় টাকা লুকানো আছে, না বুঝলেও, দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ঠিকই চলে যাবে ম্যাপল স্ট্রীটে। বাড়িটায় খুঁজতে।'

'ঠিক বলেছেন।' তুড়ি বাজালো রবিন। 'দেরি করে ফেলেছি আমরা।'

'সময় থাকলে পুলিশকে খবর দেয়া যেতো,' বললো হল। 'এখন আর সময় নেই। এক্ষুণি ম্যাপল স্ট্রীটে গিয়ে বাড়িটা খুঁজে

বের করা দরকার। তোমরা এসো আমার সংগে। বাড়িটা কেমন, মিসেস লারমার বলেছে তোমাদেরকে। তোমরা সহজে বের করতে পারবে।'

'চলুন,' উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'কিন্তু যাবো কি দিয়ে?'

'গাড়ি আছে আমার, বাইরে পার্ক করে রেখেছি। সাইকেলগুলো এখানেই থাক। পরে এসে নিয়ে যেতে পারবে।'

একটুও সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি উঠে সাইকেলে তালা লাগালো রবিন আর মুসা। লাল কুকুর চার দিয়ে গোপনে বেরিয়ে হেঁটে এসেছে কিশোর। সাইকেল আনেনি, তালা লাগানোর ঝামেলা নেই তার।

কালো একটা স্টেশন ওয়াগনের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলো হল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হলিউডের দিকে ছুটে চললো গাড়ি।

'দেয়ালের কাগজের নিচেই লুকানো আছে,' গাড়ি চালাতে চালাতে কিশোরকে বললো হল, 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। মিসেস লারমার বলেছে আমাদেরকে, তার ভাই তাদের বাড়িটায় নতুন করে কাগজ লাগিয়েছিলো, রঙ করেছিলো। আমি শিওর, টাকাগুলো তখনই লুকিয়েছে কারমল। ডেটলারের কাছে চিঠিতে সেকথা লিখতে সাহস করেনি সে, ইঙ্গিতে শুধু ঠিকানাটা বলেছে। আর খামের ওপরে এক স্ট্যাম্পের ওপর আরেক স্ট্যাম্প লাগিয়েছে।'

'কাগজের ওপর কাগজ,' মাথা ঝাঁকালো হল। 'ভালো

বুদ্ধি। ওই কাগজ ছাড়াতে যন্ত্রপাতির দরকার হবে। বাপ্প ছাড়া না ছিঁড়ে খোলা যাবে না। অসুবিধে নেই। আজ শনিবার, দোকানপাট অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। বাড়িটা আগে পেয়ে নিই, তারপর যন্ত্র কিনে নিতে পারবো।'

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে স্টেশন ওয়াগন। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, এমন একটা অঞ্চলে ঢুকে গতি কমালো হল। 'কিশোর, গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে দেখো। ম্যাপ পাবে।'

ম্যাপটা বের করে দিলো কিশোর।

ভালোমতো দেখলো হল, তারপর বললো, 'গুড। এবার সোজা যেতে হবে আমাদের। হাউসটন অ্যাভিনিয়ু ধরে কিছুদূর এগোলেই পাওয়া যাবে ম্যাপল স্ট্রীট। কতো নম্বর ব্লক বললে? পাঁচশো?'

'হয় পাঁচশো, নয়তো ছয়শো। সুপারিনটেনডেন্ট তা-ই বললো।'

'যেখানেই থাকুক, খুঁজে বের করবো। তবে দিনের আলো থাকতে থাকতেই করতে হবে। নইলে অন্ধকারে মুশকিল হয়ে যাবে।'

দ্রুত কমছে আলো।

হাউসটন অ্যাভিনিয়ুতে পৌঁছলো ওরা। বাঁয়ে মোড় নিলো হল। তিরিশ-চল্লিশটা ব্লক পেরিয়ে এসে ম্যাপল স্ট্রীটে পড়লো।

রাস্তার নাম লেখা নির্দেশক আর নেই এখন। তবু ওদের বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঠিক জায়গায়ই এসেছে। কয়েকটা

বাড়ি ইতিমধ্যেই ধসিয়ে ফেলা হয়েছে, ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের স্তূপ জমে আছে রাস্তার এখানে ওখানে। গোটা দুই বিশাল ক্রেন দেখা গেল, আর কয়েকটা বুলডোজার। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা অট্টালিকা—আশপাশের বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে—এককালে রেস্ট্ রেন্ট ছিলো, সেই স্বাক্ষর শরীরে বহন করছে এখনও। দানবীয় যন্ত্রের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। দেখে মনে হয় যেন একাধিক বোমা ফেলা হয়েছিলো বাড়িটার ওপর।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'আমরা যেটা খুঁজছি সেটা ভাঙার মধ্যে পড়েনি তো?'

'মনে হয় না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমরা যেটা খুঁজছি, আরও দুটো গলির পরে হবে।'

খোয়ার একটা স্তূপের পাশ কাটালো হল। তারপরের বাড়িগুলো সব অক্ষত, এখানে পৌঁছেনি এখনও বুলডোজার। কেমন বিষণ্ণ পরিবেশ। জীবনের চিহ্ন নেই।

অথচ, মাত্র কয়েক শো' ফুট তফাতেই ব্যস্ত নগরীর চলমান জীবনযাত্রা, সে-কারণে ম্যাপল স্ট্রীটের স্থবিরতা আরও বেশি করে চোখে লাগে। সবাই চলে গেছে। আর কিছু দিন পরে বাড়িগুলোও যাবে। তার জায়গায় গড়ে উঠবে মহাব্যস্ত মহাসড়ক।

গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে পালালো একটা বেওয়ারিস হাড় জিরজিরে বেড়াল।

'নয়শো নম্বর ব্লক,' বললো হল। 'চোখ রাখো। কাছাকাছিই আছে কোথাও বাড়িটা।'

নিরব, নির্জন বাড়িগুলোর ধার দিয়ে খুব ধীরে এগোচ্ছে গাড়ি। কোনো কোনোটার দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। যেন বোঝাতে চাইছে, বন্ধ থাক বা খোলা থাক, কিছু যায় আসে না আর এখন।

'ছয়শো নম্বর,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হল। 'দেখেছো কিছু?'

'ওই যে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। হাত তুলে একটা বাড়ি দেখালো।

'ওই যে, আরও একটা আছে। একই রকম দেখতে,' আরেকটা বাড়ি দেখালো কিশোর। 'দুটো বাড়িরই চিলেকোঠা আছে, সামনের দিকে গোল জানালা। কোনটা বুঝবো?'

'দুটো, না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো হল। 'কোনটা, বুঝতে পারছো না?'

'মিসেস লারমার বলেছে, একতলা বাড়ি। ওপরে চিলে-কোঠা, সামনের দিকে গোল জানালা। ব্যস।'

'এখানে দুটো বাড়ি ওরকম,' বিড়বিড় করলো হল। 'ঠিক আছে, চলো দেখা যাক। পরের ব্লকটা দেখি।'

পরের ব্লকে ওরকম আরেকটা বাড়ি পাওয়া গেল। দুই পাশে দুটো পাকা বাড়ি।

ওটার সামনে এনে গাড়ি রাখলো হল। 'গোল জানালা-

ওয়ালা মোট তিনটা বাড়ি দেখলাম। এটা থেকেই শুরু করি।' এদিক ওদিক তাকালো। আর কোনো গাড়ি চোখে পড়লো না। 'তিন-আঙুলেরা মনে হচ্ছে আসেনি এখনও। তাড়াতাড়ি করতে হবে। নামো।'

পনেরো

দিন শেষ। অন্ধকার নামছে।

দ্রুত একবার রাস্তার দু'দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো হল। কেউ নেই। আগের মতোই নির্জন ম্যাপল স্ট্রীট।

বাড়ির সদর দরজায় ঠেলা দিলো সে। খুললো না।

'তালা দেয়া,' বললো। 'ভাঙতে হবে।'

গাড়ি থেকে ছোট একটা শাবল বের করে নিয়ে এলো। দুই পাল্লার মাঝের ফাঁকে শাবলের চ্যাপ্টা মাথাটা ঢুকিয়ে চাড় দিলো। মড়মড় করে উঠলো পুরনো কাঠ। চাপ আরও বাড়াতেই চিলতে উঠে গেল।

খুলে ফেললো দরজা।

আগে ঢুকলো হল। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। পকেট থেকে টর্চ বের করে দেয়ালে আলো ফেললো হল। ধুলোর ছড়াছড়ি। অবহেলা অযত্নে

নোংরা হয়ে আছে। দেয়ালের কাগজ জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ফিতের মতো ঝুলছে। এটা লিভিং রুম।

'এখান থেকেই শুরু করা যাক,' বললো হল। 'ছুরি আছে কারও কাছে?'

আট ফলার প্রিয় সুইস নাইফটা বের করে দিলো কিশোর —সব সময় সংগে রাখে ওটা। ধারালো একটা ফলা খুলে আগা দিয়ে লম্বা করে কাগজের এক জায়গা কাটলো হল। কাটা জায়গাটা উল্টে দেখলো।

'এখানে নেই,' বললো সে। 'অন্য জায়গায় দেখতে হবে।'

আরেক জায়গার কাগজ একই ভাবে কাটলো সে। সেখানেও নেই। কাটলো আরও কয়েক জায়গায়। ঘরের চার দেয়ালের বিভিন্ন জায়গা কেটে দেখলো। পাওয়া গেল না।

'এঘরে নেই,' বললো হল। 'চলো, ডাইনিং রুমে দেখি।'

টর্চের আলোয় পথ দেখে খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। কিশোর বললো, 'ছুরিটা আমাকে দিন। আপনি আলো ধরুন।'

দেয়ালের এক জায়গার কাগজ কাটলো কিশোর।

কাটা জায়গাটা ধরে টান দিয়ে ওল্টালো হল।

'ওই তো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'সবুজ কি যেন।'

আলোটা কিশোরের হাতে দিয়ে ছুরিটা নিয়ে নিলো হল। 'আলো আরও কাছে আনো।' ছুরি দিয়ে কাগজের আরও একটু কাটলো সে। সত্যি, সবুজ দেখা যাচ্ছে।

'নিচে আরেকটা কাগজ,' বললো হল। 'এর নিচে কি আছে

দেখা যাক।'

নিচে আবার সেই কাঠ।

ডাইনিং রুমে পাওয়া গেল না। প্রথম বেডরুমটায় ঢুকলো ওরা। দেয়াল চিরে চিরে দেখলো। দ্বিতীয় বেডরুমেও একই অবস্থা, দেয়ালের কাগজ ফালা ফালা করেও নিচে কিছু পাওয়া গেল না। বাথরুম আর রান্নাঘরের দেয়ালে কাগজ নেই, নানা-রকম ছবি আঁকা।

একটা মই খুঁজে নিয়ে চিলেকোঠায় উঠলো কিশোর। এখা-নেও দেয়ালে কাগজ নেই। নেমে এলো।

'এ-বাড়িতে নেই,' বললো হল। উত্তেজনায় ঘামছে। 'চলো, আরেকটায় দেখি।'

বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরেও অন্ধকার। শুধু পথের দুই মাথায় দুটো লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে। আলো নেই, কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে শূন্য বাড়িগুলোকে।

প্রথম যে বাড়িদুটো দেখেছিলো, তার একটার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। এটার সদর দরজায় তালা নেই, খোলা।

ভেতরে ঢুকলো চারজনে।

দেয়ালে নতুন কাগজ। 'বোধহয় এটাই,' আশা হলো হলের। 'কিশোর, কাটো।'

কাটলো কিশোর।

উল্টে দেখলো হল।

কিছুই নেই।

এই বাড়িরও প্রতিটি ঘরের দেয়ালে যেখানেই কাগজ দেখা গেল, কেটে দেখলো ওরা। সবাই উত্তেজিত। কিছুই পেলো না এখানেও।

'আর বাকি রইলো একটা,' আশা-নিরাশায় দুলছে মন, হলের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। 'ওটাতেই থাকবে।'

তৃতীয় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

দরজা বন্ধ। ভাঙার জন্যে তৈরি হয়েছে, হঠাৎ দরজার গায়ে আলো ফেললো কিশোর। চকমক করে উঠলো কাঠের পাল্লায় বসানো ধাতব নম্বর।

'জলদি নেভাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো হল। 'দেখে ফেলবে কেউ।'

'দেখলাম,' বললো কিশোর। 'মনে হচ্ছে এটাই মিসেস লারমারের বাড়ি।'

'কি দেখলে?' ফিসফিস করে বললো রবিন। এলাকাটা এতোই নিরব, জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে সে।

'হ্যাঁ, কি দেখলে?' হলও জিজ্ঞেস করলো।

'নম্বর। ছয়শো একাত্তর,' জবাব দিলো কিশোর। 'জায়গা বদলানোর পর বাড়ির নতুন নম্বর। আগে অন্য নম্বর ছিলো, তুলে ফেলা হয়েছে, দাগ দেখলাম।'

'তাই? দেখি তো আবার! জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলবে।'

টর্চের গোল আলো পড়লো আবার নম্বরের ওপর। চার-জনেই দেখলো, নতুন নম্বর প্লেটের ওপরে কাঠে দাগ, রঙ করেও

পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। কিংবা হয়তো তেমন চেষ্টা করেনি নতুন মালিক। বেশ স্পষ্টই দেখা যায় দাগটা।

'পাঁচশো বত্রিশ!' চেঁচাতে গিয়েও স্বর নামিয়ে ফেললো মুসা। 'পেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'চলো, এখন ভেতরে ঢুকি,' হল বললো।

চড়মড় শব্দ করে কাঠ ভাঙলো, চিলতে উঠলো, খুলে গেল দরজা।

কে কার আগে ঢুকবে, হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিলো। তর সইছে না আর। উত্তেজনায় দ্রুত হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। শিওর এবার পাওয়া যাবেই। এই বাড়িরই কোনো একটা দেয়ালে কাগজের তলায় লুকানো রয়েছে পাঁচ লাখ ডলার।

'আলো আরও কাছে আনো, কিশোর,' হল বললো।

অন্য দুটো বাড়ির তুলনায় ভারি করে কাগজ লাগানো এটার দেয়ালে।

এক হাতে টর্চ ধরে আরেক হাতে ছুরি দিয়ে পোঁচ লাগালো কিশোর।

কাগজের কাটা জায়গা ওল্টালো হল। কাঠ দেখা গেল, টাকা নেই।

'এক কোণা থেকে শুরু করি,' বললো সে। 'পাঁচ লাখ ডলার জোড়া লাগালে অনেক বড় চাদর হবে। ওখান থেকে কাটো। জলদি।

একটা দেয়াল দেখা শেষ হলো।

দ্বিতীয় দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোর। দু'দিক থেকে তার গায়ের ওপর প্রায় চেপে এলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

পোঁচ দিতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা শব্দ শুনে স্থির হয়ে গেল।

'কী...,' শুরু করলো বটে হল, কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারলো না।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজার ভেজানো পাল্লা। ভারি জুতোর শব্দ। বড় একটা টর্চের চোখ ধাঁধানো আলো এসে পড়লো চারজনের গায়ে।

'বেশ,' গর্জে উঠলো কুৎসিত একটা কণ্ঠ, 'এবার মাথার ওপর হাত তোলো দেখি, বাপুরা।'

খোল

আদেশ পালন করলো চারজনেই।

তীব্র আলোয় চোখ মিটমিট করছে কিশোর। টর্চের ওপাশের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'পুলিশ?' বললো হল। 'আমি নরম্যান হল। স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর...'

খরখরে হাসি থামিয়ে দিলো তাকে। 'নরম্যান হল, না? ভালো, ভালো। ছেলেগুলোকে এই কথাই বলেছো বুঝি?'

আলোর দিক থেকে চোখ ফেরালো কিশোর। বুঝতে পারলো, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার হল ব্যাংকারস প্রোটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনের লোক নন?'

আবার খরখরে হাসি। 'ওই ব্যাটা?' বললো কুৎসিত কণ্ঠ। 'ওর আসল নাম ডিকটা সলোমন। ইউরোপের সমস্ত চোরের ওস্তাদ। কোন্ দেশের পুলিশ ওকে খুঁজছে না?'

'কিন্তু অফিসিয়াল কার্ড সে দেখালো,' প্রতিবাদ করলো মুসা।

'ওরকম কার্ড ওর কাছে কয়েক ডজন আছে। জাল আইডেনটিটি কার্ড বানানো কোনো ব্যাপারই না। খুব ফাঁকি দিয়েছে তোমাদের, খারাপ লাগছে নিশ্চয়? দুঃখ করো না। বাবা বাবা পুলিশ অফিসারকে বহুবার নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ও।

'তারপর, মিস্টার সলোমন? ভেবেছিলে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। ফাঁকিটা প্রায় দিয়ে ফেলেছিলে। এই কোঁকড়াচুলো ছেলেটাই ধরিয়ে দিলো। ইয়ার্ডের ওপর চোখ রাখছিলাম। ওয়ার্কশপে ঢুকতে দেখলাম, তারপর আর বেরোনোর নামগন্ধ নেই। সন্দেহ হলো। নিশ্চয় অন্য কোনো পথে বেরিয়ে গেছে। গতকাল এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। ভাবলাম, এদিকেই এসেছে। আমার অনুমান ঠিকই হয়েছে। দরজার ওপর আলো ফেলা হলো, দেখলাম।'

'তুমি তিন-আঙুলে, না?' জিজ্ঞেস করলো নরম্যান হল, ওরফে ডিকটা সলোমন। 'শোনো, আমরা হাত মেলাতে পারি। টাকাগুলো এখনও পাইনি। পেলে...'

'চুপ!' ধমকে উঠলো টর্চধারী লোকটা। 'টাকাগুলো বের করে আমরা নিয়ে যাবো। তোমাকে ফেলে যাবো পুলিশে ধরার জন্যে। আমাদেরকে সেবার ঠকিয়েছিলে না, এবার তার শোধ নেবো। ঘোরো এখন দেয়ালের দিকে। ছেলেরা, তোমরাও।... নরিস, ট্যানটন, দড়ি বের করো। বাঁধো ওদেরকে। হারামীটাকে

শক্ত করে বাঁধবে।'

নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে কিশোরের, ডিকটা সলোমনের ফাঁকিতে পড়েছে বলে। ধড়িবাজ লোক। প্রথমেই জেনে নিয়েছে, চীফ ইয়ান ফ্লেচার শহরের বাইরে। তারপর একটা গল্প বানিয়েছে। আর গর্দভের মতো তার সেই গল্পের ফাঁদে পা দিয়েছে সে।

ওই রিপোর্টার ব্যাটাই যতো সর্বনাশের মূল। যতো রাগ ক্যাল উইলিয়ামসের ওপর গিয়ে পড়লো কিশোরের। কাগজে ফলাও করে ছেপেছে ডেটলারের ট্রাংকের কথা, তিন গোয়েন্দার ছবি ছেপে দিয়েছে, নইলে এভাবে চোর-ডাকাতের চোখ পড়তো না তাদের ওপর।

কিন্তু এখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই।

পিঠের ওপর হাত এনে কব্জির ওপর কব্জি রেখে বাঁধা হলো। তারপর মেঝেতে বসিয়ে দুই পা এক করে হাঁটুর কাছ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পেঁচিয়ে বাঁধা হলো।

'হ্যাঁ, এইবার হয়েছে,' সলোমনের বাঁধনে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে বললো তিন-আঙুলে ড্রেক। খরখরে হাসি হাসলো। 'মুখ বাঁধার দরকার নেই। ইচ্ছে হলে গলা ফাটিয়ে চিল্লাও। কেউ শুনবে না। তবে মরবে না, এই কথা দিতে পারি। কাল রবিবার, এভাবেই থাকতে হবে তোমাদের। পরশু সোমবার সকালে শ্রমিকেরা কাজে আসবে। তখন জোরে জোরে চিল্লালে, ওরা শুনতে পাবে। এসে খুলে দেবে বাঁধন। ঠিক

আছে?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো সে।

অস্পষ্ট দেখা গেল, ড্রেক মোটাসোটা লোক। তার দুই সঙ্গী তার মতো মোটা নয়, আবার রোগাটেও নয়। চেহারা দেখা গেল না।

খানিক আগে কিশোররা যা করছিলো, সেই কাজে মন দিলো এবার তিন আগন্তুক। দেয়ালের কাগজ চিরে চিরে দেখতে শুরু করলো।

'দেয়ালের কাগজের তলায় টাকা লুকিয়েছে, না?' বকবক করে চললো ড্রেক। 'ভালো বুদ্ধি, চমৎকার বুদ্ধি। তোমাদেরও বুদ্ধি আছে, ঠিক বুঝে ফেলেছো। যা হোক, কাজ কমিয়ে দিয়েছো আমাদের। আমরা তো কতো মাথা ঘামালাম, বুঝতেই পারিনি কিছু। কোঁকড়া-চুল ছেলেটার বুদ্ধি, না? নাম কি ওর, সলোমন?'

'কিশোর। ডেটলারের চিঠিতেই ছিলো সূত্র। চিঠিতে আর খামের ওপরে। ট্রাংকের ভেতরে ছিলো ওগুলো।'

'বরাবরই সন্দেহ ছিলো আমার,' বললো ড্রেক। 'সে-জন্যেই ট্রাংকটা চাইছিলাম। লম্বুটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নিয়েও এলো নরিস আর ট্যানটন। কিন্তু ওদের পেছনেও লোক লেগেছিলো, খেয়াল করেনি। ট্রাংকটা কেড়ে নিলো আবার। তুমি নিয়েছিলে, সলোমন?'

'না। কে নিয়েছিলো কিছুই জানি না আমি।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলো ড্রেক। 'কে নিলো তাহলে?

এই ছেলেরা নিশ্চয় নয়।'

'না, ওরা নয়,' জবাব দিলো তার এক সহকারী। 'চার-পাঁচজন এসেছিলো। মুখে রুমাল বাঁধা। ওস্তাদ লোক। বুঝ-লামই না কি হতে কি হলো। শুধু দেখলাম, আমরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। ট্রাংকটা হাওয়া'।

'কারা ওরা?' বলে নিজে নিজেই জবাব দিলো ড্রেক, 'হবে অন্য কোনো দল, আমাদের মতোই টাকাগুলোর পেছনে লেগেছে। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাংকটা হাতে পেয়েও সুবিধে করতে পারেনি। নইলে এতোক্ষণে এসে যেতো এখানে। নরিস, ট্যান-টন, আরও জলদি হাত চালাও।'

মেঝেতে বসে নিরবে তাকিয়ে রইলো চার বন্দি।

দ্রুত দেয়ালের কাগজ কাটছে দু'জনে, টেনে টেনে ছিঁড়ছে। কিশোর দেখছে, আর অবাক হয়ে ভাবছে—ট্রাংকটা নরিস আর ট্যানটনের কাছ থেকে কারা ছিনিয়ে নিয়েছিলো? নিশ্চয় ওরাই আবার ট্রাংকটা পাঠিয়েছে তিন গোয়েন্দার কাছে। কারা? কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না সে।

লিভিং রুমের চার দেয়ালের সমস্ত কাগজ ছিঁড়ে ফেলা হলো। টাকা পাওয়া গেল না।

'এঘরে নেই,' ড্রেক বললো। 'সলোমন, কোন ঘরে আছে, জানলে বলো। তাহলে ছেড়ে দেবো।'

'জানলে কি আর অতো কাটাকাটি করতাম নাকি?' জবাব দিলো সলোমন। 'প্রথমেই তো গিয়ে কেটে বের করে নিতাম।

তবে, এক কাজ করতে পারো। আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো।'

'না, সেটি হচ্ছে না। টাকাগুলো পেলেই কিছু একটা করে বসবে। আর তোমার ফাঁকিতে পড়ছি না, একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ভেজা সাবানের মতো পিচ্ছিল তুমি, মিস্টার ডিকটা সলোমন।' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললো ড্রেক, 'এই চলো, অন্য ঘরে যাই।'

বন্দিদেরকে অন্ধকারে ফেলে রেখে বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো ওরা। কাগজ কাটা ছেঁড়ার আওয়াজ শুরু হলো।

'সরি,' নিচুকণ্ঠে বললো সালোমন। 'তোমাদের এ-অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। বিশ্বাস করো, চালাকি করি বটে, খুনখারা-পিতে আমি কখনোই যাই না। গায়ের জোর খাটানোর চেয়ে মগজ খাটানোই আমার বেশি পছন্দ।'

'দোষ আমারও আছে,' গম্ভীর শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'আমি আপনাকে সন্দেহ করলাম না কেন?'

চুপ হয়ে গেল ওরা। কাগজ ছেঁড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে গাল দিয়ে উঠছে তিন ডাকাতের কেউ একজন, টাকা না পাওয়ার নিরাশায়।

তারপর, আবার সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। এবার আর ঝটকা দিয়ে নয়, খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খোলা হচ্ছে।

খোলা দরজায় একটা ছায়ামূর্তি আবছাভাবে দেখা গেল,

একজন মানুষ।

'কে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'চুপ!' ফিসফিস করে জবাব এলো। 'তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। চুপ করে থাকো।'

আরেকজন ঢুকলো, আরও একজন। তারপর আরও কয়েকজন। এতটুকু শব্দ করলো না কেউ।

'সাবধান!' প্রথম লোকটার কণ্ঠ। 'দেয়াল ঘেঁষে থাকবে,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে। 'ব্যাটারা দরজা দিয়ে বেরোনোর সংগে সংগে মাথায় ছালা পড়িয়ে দেবে। ছুরি-টুরি বাদ। রক্তারক্তি যেন না হয়।'

খুবই অবাক হয়েছে তিন গোয়েন্দা। হতাশা দূর হয়েছে অনেকখানি। সত্যি যদি ওদেরকে বাঁচাতে এসে থাকে ওরা, তাহলে সোমবার পর্যন্ত আর বেকায়দা অবস্থায় বসে থাকতে হবে না এখানে। কিন্তু লোকগুলো কে? পুলিশ নয়, এটা ঠিক। সত্যি কি বন্ধু ওরা? নাকি ওরাও আরেকটা খারাপ দল, যারা টাকাগুলো চায়?

ভেতরের ঘর থেকে ঝাঁঝালো কণ্ঠ শোনা গেল। ভীষণ বিরক্ত। বোঝা গেল, টাকা খুঁজে পায়নি। লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে আসছে ওদের পায়ের শব্দ।

দরজায় এসে দাঁড়ালো তিন-আঙুলে। বন্দিদের ওপর আলো ফেলে কড়া গলায় বললো, 'ফাঁকি দিয়েছো। দেয়ালের কাগজ কেটে রেখে, আমাদের দেখিয়ে ফাঁকি দিয়েছো। বাঁচতে চাইলে সত্যি কথা বলো। কোথায় আছে টাকা?'

সতেরো

কয়েকটা ছায়ামূর্তি একসংগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ড্রেকের ওপর। একটানে তাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে আনলো। আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি গিয়ে ধরলো নরিস আর ট্যানটনকে। আক্রমণ আশা করেনি ওরা, তাই সহজেই ধরা পড়ে গেল।

হাত থেকে টর্চ ছেড়ে দিয়েছে ড্রেক। ঝাড়া দিয়ে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

মাটিতে পড়েও টর্চটা নেভেনি। যদিও অন্যদিকে আলো দিচ্ছে, লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। আগের বন্দিরা বসে বসে দেখলো, তিন-আঙুলের মাথায় ছালা পরিয়ে দেয়া হলো। বেশি ধস্তাধস্তি করছে। ল্যাঙ মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো একজন। উপুড় করে চেপে ধরলো কয়েকজনে।

'জলদি ব্যাটাদের বাঁধো,' আদেশ দিলো সেই প্রথম লোকটা।

ধরা কি আর দিতে চায়? আরও কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হলো। অবশেষে হার মানতে বাধ্য হলো তিন ডাকাত।

চেঁচিয়ে গালাগাল শুরু করলো তিন আঙুলে। ছালা ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওর মুখে। তার ওপর দড়ি পেঁচিয়ে কথা বন্ধ করা হলো ওর। হাত-পা কষে বেঁধে মেঝের ওপর ফেলে রাখা হলো তিন ডাকাতকে।

'ভেরি গুড,' বললো প্রথম লোকটা। 'তোমরা বাইরে যাও। ছেলেগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে আসছি আমি।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তার দলের সবাই। টর্চটা তুলে ছেলেদের ওপর ফেললো সে। 'কপাল ভালো তোমাদের। ধরার সময় ওপরে পড়েনি কেউ। তাহলে ভর্তা হয়ে যেতে।'

'আরেকটু হলেই আমার ওপর পড়তো ড্রেক,' বললো কিশোর।

'হুঁ,' শব্দ করে হাসলো লোকটা। বড় এক ছুরি বের করে এগিয়ে এলো। কাছে এসে বসলো। দেখা গেল লোকটার পুরু গোঁফ।

চিনে ফেললো তাকে কিশোর। 'আপনি!' এই লোকই সেদিন জিপসিদের বাড়িতে দরজা খুলে দিয়েছিলো, পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো জিপসি শেরিনার ঘরে।

হাসলো আবার লোকটা। 'হ্যাঁ, আমি। টাকিনো।' কিশোরের বাঁধন কাটতে শুরু করলো।

'কিন্তু... কিন্তু এখানে এলেন কিভাবে?' হাতের কব্জি ডলতে

ডলতে বললো কিশোর।

'পরে,' জবাব দিলো লোকটা। 'এখন সময় নেই। ...আরি, বড়টা গেল কোথায়?'

এতোক্ষণে খেয়াল হলো তিন গোয়েন্দার। পাশে তাকালো। ডিকটা সলোমনকে দেখতে পেলো না। ছটো কাটা দড়ি পড়ে আছে।

'পালিয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'সলোমন পালিয়েছে! নিশ্চয় ছুরি বা ব্লেড কিছু ছিলো ওর কাছে। গোলমালের সময় দড়ি কেটে পালিয়েছে।'

'ওকে আর ধরা যাবে না,' বললো টাকিনো। 'যাআক, তিনটাকে তো পেলাম। ওদেরকেই পুলিশে দেবো।' রবিন আর মুসারও বাঁধন কেটে দিয়ে বললো, 'এখন বাইরে এসো তো। শেরিনা তোমাদের সংগে কথা বলবে।'

শেরিনা! জিপসি মহিলা! টাকিনোর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। মোড়ের কাছে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে পুরনো গাড়ি। পেছনের ছটোতে গাদাগাদি করে লোক বসেছে। সামনের গাড়িটাতে বসে আছে মহিলা।

শেরিনা-ই। জিপসিদের পোশাক পরেনি, বোধহয় লোকের চোখ যাতে না পরে সে-জন্যে।

'ছেলেরা ভালোই আছে, শেরিনা,' টাকিনো বললো। 'চোট-টোট লাগেনি। তিনটে শয়তানকে বেঁধে ফেলে এসেছি। একটা পালিয়েছে।'

'পালাক,' শান্তকণ্ঠে বললো শেরিনা। 'এই, তোমরা গাড়িতে ওঠো,' ছেলেদের বললো। 'কথা আছে।'

এক সীটে চারজন, ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো। টাকিনো দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে, পাহারা দিচ্ছে।

'তারপর, কিশোর পাশা, আবার দেখা হলো আমাদের,' বললো শেরিনা। 'কাচের বলে দেখতে পেয়েছি তোমাদের। তাই তাড়াহুড়ো করে ছুটে এলাম।'

'আসলে, আমাদের পিছু নিয়েছিলেন, না?' কাচের বলের কথা বিশ্বাস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো শেরিনা। 'তুমি আমার সংগে দেখা করে যাওয়ার পর থেকেই তোমাদের ওপর চোখ রাখা হয়েছিলো। কাচের বলে দেখলাম বিপদ, তাই তোমাদেরকে বিপদমুক্ত রাখার জন্যে ওদেরকে লাগিয়েছিলাম। তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করলো, তাদেরকে অনুসরণ করলো টাকিনো আর তার লোকেরা। আজ রাতেও ওই একই ব্যাপার হয়েছে। একটা গাড়ি নিয়ে পিছু নিয়েছিলো টাকিনো। তোমরা এখানে এসেছো, ফোনে জানালো আমাকে। দুই গাড়ি লোক নিয়ে ছুটে চলে এলাম। এখন আসল কথায় আসা যাক। টাকাগুলো পেয়েছো?'

'না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'নেই এখানে। অথচ আমি শিওর ছিলাম, এখানেই আছে। চিঠিতে তো সেটাই ইঙ্গিত করা আছে।'

'চিঠিতে সূত্র আছে এটা ডেটলার বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু ধাঁধাটার সমাধান করতে পারেনি,' বললো শেরিনা।

'ডেটলারকে চেনেন নাকি?'

'সম্পর্ক আছে,' ঘুরিয়ে বললো শেরিনা। 'ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমি। পয়লা দিন দেখেই বুঝেছি তুমি চালাক ছেলে। ধাঁধার সমাধান করতে পারবে। টাকাগুলো কোথায় কোথায় খুঁজেছো?'

'দেয়ালের কাগজের তলায়। ওখানে থাকতে পারে, কেউ ভাববে না। অনেক খুঁজলাম, পাওয়া গেল না।'

'আর কোথায় থাকতে পারে?'

'চিঠিতে খোলাখুলি বলতে পারেনি কারমল। ইঙ্গিতে বলেছে। সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেই...'

'দেয়ালের কাগজের তলায় আছে, এটা মনে হয়েছিলো কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে শেরিনা। 'বলো, তাড়াতাড়ি করো।'

'খামের ওপরের স্ট্যাম্প লাগানো দেখে,' রবিন জানালো। 'পাশাপাশি দুটো স্ট্যাম্প, একটা দুই সেন্টের, একটা চার। চার সেন্টের স্ট্যাম্পটার তলায় আবার সবুজ একটা এক সেন্টের...'

'রবিন!' বলে উঠলো কিশোর।

'কী! কি হয়েছে?'

'শেষ কথাটা কি বললে?'

'বললাম চার সেন্টের...'

'দাঁড়াও! সূত্রটা এখানেই।'

'কোথায় সূত্র ?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'মিস শেরিনা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কিশোর, 'কারমলের উচ্চারণে একটা খুঁত ছিলো। "এল" অক্ষরটা বলতে পারতো না।'

'তাতে কি ?' বুঝতে পারছে না শেরিনা।

'তাতে ?' "ফ্লোর"কে কি উচ্চারণ করতো সে ? ফোর। তারমানে ফোর সেন্টের স্ট্যাম্প···'

'ফ্লোরের নিচে আছে টাক !' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'মেঝের তলায়। কারমলের উ ভুল আছে জানতো ডেট-লার। বন্ধু বুঝতে পারবে আ করেই এই ফন্দিটা করেছিলো কারমল।'

'কিন্তু বন্ধু বুঝতে পারেনি। আমরাও ভুল করেছি। স্ট্যাম্পের ওপরে স্ট্যাম্প দেখে ভেবেছি দেয়ালের কাগজের তলায় আছে। উচ্চারণের দোষের কথাটা একবারও ভাবিনি। আরও একটা ব্যাপার বোঝা উচিত ছিলো আমার, টাকায় আঠা লাগালে সেই আঠা ছাড়ানোও কম ঝামেলা নয়। তারপর, কাগজের তলায় সেঁটে রাখলে নষ্ট না করে খুলে আনা আরও কঠিন, প্রায় অসম্ভব। ওরকম একটা কাজ কেন করতে যাবে কারমলের মতো বুদ্ধিমান মানুষ ?'

'টাকিনো,' ডাকলো শেরিনা। 'ও-গাড়ি থেকে শাবল বের করে আনো। জলদি।'

খানিক আগে যেখানে বন্দি হয়েছিলো, সেখানে আবার

এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। সংগে টাকিনো আর শেরিনা।

ভেবে দেখলো কিশোর, কারমল হলে সে কোন্ ঘরের মেঝেতে টাকাগুলো লুকাতো ? লিভিং রুমে নিশ্চয় নয়। তার বোন কিংবা দুলাভাইয়ের বেডরুমে তো নয়ই। হয় গেস্ট রুম, যেখানে কারমল ঘুমাতো, নয়তো চিলেকোঠায়।

গেস্ট রুমের সম্ভাবনাটা বাদ দিয়ে দেয়া যায়। কারণ, বাড়িটা সরানো হয়েছে। টাকাগুলো ওখানে থাকলে বাড়ি সরানোর সময়ই বেরিয়ে পড়তো। বেরিয়েছে কিনা জানার উপায় নেই, টাকাগুলো পেয়ে যদি কথাটা গোপন রেখে থাকে নতুন বাড়িওয়ালা ? দেখার জায়গা এখন একটাই, চিলেকোঠার মেঝেতে।

দশ মিনিট চেষ্টা করেই কোণের একটা তক্তা তুলে ফেললো টাকিনো। দুই থাক তক্তা দিয়ে তৈরি মেঝেটা। পাশের আরেকটা তক্তা সরিয়েই স্থির হয়ে গেল সে।

টর্চের আলোয় দেখা গেল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা সবুজ নোটের পাতলা অসংখ্য বাণ্ডিল। পলিথিনে পেঁচানো।

'ফোর, মানে ফ্লোরের নিচে।' বিড়বিড় করলো মুসা। 'কি বুদ্ধি! সবুজ স্ট্যাম্পের ওপরে চার সেন্টের স্ট্যাম্প···নাহ্, লোকটা জিনিয়াস ছিলো।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'তোমরাও কম জিনিয়াস নও,' শেরিনা বললো। 'কারমলের সংগে এতো ঘনিষ্ঠতা থাকার পরেও ডেটলার যা বুঝতে পারেনি···যা হোক, অবশেষে পাওয়া তো গেল। কয়েকটা ডাকাতও

ধরা পড়লো। পুকুরে পড়া ব্যাঙেরাও নিরাপদে উঠে এলো পানি থেকে।' হাসলো মহিলা।

'আপনি! আপনি আমাদের হুঁশিয়ার করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ, আমিই লোক পাঠিয়েছিলাম তোমাদের ইয়ার্ডে।... এখানকার কাজ শেষ। চলো যাই। পুলিশকে ফোন করতে হবে। টাকাগুলো এসে নিয়ে যাবে, ডাকাতগুলোকেও।'

'এক মিনিট, মিস শেরিনা,' হাত তুললো কিশোর। 'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। ট্রাংকটা আমাদের কাছে ফেরত গেল কিভাবে? আর খুলিটা কি সত্যি কথা বলে...'

'পরে, পরে। দু'চার দিন পর সেই পুরনো ঠিকানায় আবার দেখা করো আমার সংগে। ওই বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি আবার আমরা। পুলিশের ভয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব তো অন্তত দেবেন? ডেটলার কোথায়?'

'মারা গেছে, না?' মুসা বললো।

'আমি তা বলিনি,' শেরিনা বললো। 'বলেছি, মানুষের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে সে। তার ভয়ের দিন শেষ হয়েছে। আবার হয়তো ফিরে আসবে মানুষের দুনিয়ায়।'

বাইরে বেরোলো পাঁচজনে।

গাড়িতে গিয়ে উঠলো টাকিনো।

শেরিনা বললো, 'আশা করি, বাস ধরে বাড়ি ফিরে যেতে

পারবে।'

'পারবো,' জবাব দিলো কিশোর।

জিপসি মহিলাও গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

চলে গেল তিনটে গাড়ি।

'হুফ্‌ফ্‌!' গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো মুসা। 'টাকাগুলো পেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'শেরিনা সাহায্য না করলে পারতাম না,' কিশোর বললো। 'ঠিক চার দিন পর আবার যাবো ওর বাড়িতে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে হবে।'

আঠারো

সাত দিন পর।

বিখ্যাত পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন পরিচালক। মুখ তুললেন। 'বসো। হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুনবো।'

খসখস করে কি যেন লিখে সামনের ফাইলটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলেন তিনি। হাত বাড়ালেন রবিনের দিকে। 'দেখি, দাও।'

নতুন কেসের রিপোর্ট লেখা ফাইলটা ঠেলে দিলো রবিন।

অনেকক্ষণ একটানা নিরবতা। পুরো ফাইল পড়ে শেষ করে আবার মুখ তুললেন পরিচালক। 'ভালো দেখিয়েছো। এতো দিন চেষ্টা করে পুলিশ যা পারেনি, তোমরা...'

'আরও আগেই পারা উচিত ছিলো, স্যার,' বললো

কিশোর। 'দেয়ালে ওয়াল পেপারের নিচে টাকা লুকানো আছে, এটা ভেবেই ভুল করেছি। ভাগ্য ভালো...'

'ভাগ্য তাদেরই ভালো হয়, যারা সদা-সতর্ক থাকে,' একটা প্রবাদ বললেন পরিচালক। 'ভুল করো আর যা-ই করো, শেষে তো ঠিক করেছো। টাকাগুলো বের করে ছেড়েছো।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, স্যার।'

'তবে গেছো একেবারে শেষ সময়ে। আর দু'দিন দেরি করলেই যেতো এতোগুলো টাকা, মাটিতে মিশিয়ে দিতো বুল-ডোজার। তো, পুরস্কার কি পেয়েছো?'

মাথা নাড়লো কিশোর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা।

'না, স্যার,' রবিন বললো। 'আসলে কোনো পুরস্কারই ঘোষণা করা হয়নি, ডিকটা সলোমন মিছে কথা বলেছিলো। তবে, ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট খুব প্রশংসা করে একটা চিঠি দিয়েছেন আমাদেরকে। বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, তাঁকে দিয়ে সাহায্য হবে এমন কোনো অসুবিধেয় পড়লেই যেন যাই তাঁর কাছে। সব চেয়ে বড় পুরস্কার পাবো বোধহয় চীফ ইয়ান ফ্লেচারের কাছ থেকে। জুনিয়র ডিটেকটিভ হিসেবে আমাদেরকে পুলিশ ফোর্সে নিয়ে নেয়ার সুপারিশ করেছেন তিনি তাঁর বসকে।'

'ভেরি গুড। টাকার চেয়ে এগুলো অনেক বড় পুরস্কার। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। প্রথম, প্রশ্ন,

ডেটলারের কি হয়েছিলো !'

হাসলো ছেলেরা। জানতো, এই প্রশ্নটা করবেনই তিনি।

কিশোর বললো, 'ডেন কারমলের কাছ থেকে চিঠি পেলো ডেটলার। জেলে থাকতেই তাকে টাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলো কারমল। বলেছিলো, পরে চিঠিতে জানাবে। চিঠি পেলো ডেটলার, কিন্তু ধাঁধার সমাধান করতে পারলো না। চিঠিটা ট্রাংকে লুকিয়ে রাখলো সে।

'একদিন বাইরে থেকে হোটেলে ফিরছে ডেটলার। ক্লার্ক তাকে ডেকে বললো, কয়েকজন লোক দেখা করতে এসেছিলো। তাদের চেহারার বর্ণনাও দিলো। তিন-আঙুলেকে আগেথেকেই চেনে ডেটলার, ভয় পেয়ে গেল। ড্রেককে দিয়ে সবই সম্ভব। টাকার জন্যে নিজের মায়ের পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না। পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা ভাবলো ডেটলার। কিন্তু পুলিশ যদি তার কথা বিশ্বাস না করে ? চিঠির রহস্যের তো সমাধান করতে পারেনি সে। দ্বিধায় পড়ে পুলিশের কাছেও গেল না।

'ক্লার্কের ওখান থেকে আর নিজের ঘরে যায়নি ডেটলার। সোজা বেরিয়ে গিয়েছিলো। তার সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে গিয়েছিলো ওই হোটেলে। সেগুলো পরে নীলামে বিক্রি করে দিয়ে বিলের টাকা উসুল করে নেয় হোটেলের মালিক।'

'তাহলে ডেটলার মরেনি ?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন পরিচালক। 'কিন্তু শেরিনা যে বললো মানুষের দুনিয়া থেকে চলে

গেছে সে।'

'তা-ই করেছিলো,' হাসলো কিশোর। 'এমনভাবে লুকিয়েছিলো যাতে তিন-আঙুলে আর তার দোসররা খুঁজে না পায়। উইগ পরে, মেকাপ করে মেয়েমানুষ সেজেছিলো। পুরুষ মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো।'

'ও, এই ব্যাপার,' বললেন পরিচালক। 'জিপসি শেরিনাই তাহলে ডেটলার !'

রবিন আর মুসা হাসলো।

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো। 'জিপসিরা ডেটলারের পুরনো বন্ধু। শুধু বন্ধু না, আত্মীয়ও। ডেটলারের মা ছিলো জিপসি। কাজেই, হোটেল থেকে সোজা গিয়ে ওদের ওখানে উঠলো সে, লুকিয়ে রইলো।'

পরিচালকের মুখেও হাসি ফুটলো। 'তিন-আঙুলে নিশ্চয়, কল্পনাও করেনি রাতারাতি জিপসি মহিলা হয়ে যাবে যাদুকর। শেরিনা কি ডেটলার হয়েছে আবার ?'

'হ্যাঁ। তিন-আঙুলে আর তার দুই সঙ্গীকে ধরে পুলিশে জেলে ঢোকানোর পর।'

'তোমরা ট্রাংকটা কেনার পর এক বৃদ্ধা মহিলা তোমাদের কাছ থেকে ওটা নিতে চেয়েছিলো। তাহলে কি ...'

'হ্যাঁ, স্যার। ডেটলারই। বৃদ্ধা সেজে গিয়েছিলো। খোঁজ খবর রেখেছিলো। যেই শুনলো তার ট্রাংকটা নীলামে উঠছে, ছুটে গিয়েছিলো। তবে দেরি করে ফেলেছিলো কিছুটা।'

'তাতে বরং লাভই হয়েছে ওর, তোমাদের সাহায্য পেয়েছে। আচ্ছা রিপোর্টারকে দেখে পালিয়েছিলো কেন? বিজ্ঞাপনের ভয়ে?'

'হ্যাঁ। তার ছবি যদি ছাপা হয়, আর কোনোভাবে চিনে ফেলে তিন-আঙুলে···যদিও ভয়টা ছিলো অমূলক। বৃদ্ধার ছবি দেখে তাকে ডেটলার বলে কোনোদিনই চিনতে পারতো না ড্রেক। খবরের কাগজে সংবাদটা পড়ে ট্রাংকটা চুরি করতে এলো ওর দুই সঙ্গী, ইয়ার্ডে। পারলো না। তারপর হ্যামলিনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু রাখতে পারলো না। জিপসিরা পেছনেই ছিলো। ওরা আবার ছিনিয়ে নিলো। চোরের ওপর বাটপারি।'

'তারপর ডেটলার তোমাদের নামে পাঠিয়ে দিলো,' বললেন পরিচালক। 'নিশ্চয় কোনোভাবে জেনেছিলো, তোমরা ভালো গোয়েন্দা। এরকম অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছো। চিঠি-রহস্যের সমাধানও নিশ্চয় করতে পারবে। ভুল করেনি সে। তার আইডিয়া ঠিকই ছিলো।' আনমনে টেবিলে আঙুল দিয়ে টাটু বাজালেন একবার পরিচালক। 'এখন আসল প্রশ্নটা। সক্রেটিস। কিভাবে কথা বলানো হয় ওকে দিয়ে?'

'ডেটলার খুব ভালো ভেনট্রিলোকুইস্ট। শুরুতে, ভেনট্রিলোকুইজমের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নিতো। পরে, লোকের সন্দেহ দেখা দিলো। নতুন কিছুর চিন্তাভাবনা করতে লাগলো যাদুকর। শেষে খুব ছোট একটা ওয়্যারলেস সেট কিনলো, আজ-

কাল তো ওসবের অভাব নেই···'

'এবং ওটা বসিয়ে নিলো খুলির ভেতরে?'

'না, স্যার, খুলির ভেতরে নয়। চালাকিটা করেছেই ওখানে। ওটাকে ভরেছে হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডের ভেতরে। লোকে চ্যালেঞ্জ করলে খুলিটা তাদের হাতে তুলে দিতো। কিছুই পাওয়া যেতো না ওটার ভেতর। কেউ ভাবেইনি চালাকিটা করা হয়েছে স্ট্যাণ্ডের মধ্যে···'

'তুমিও ভাবোনি।'

'না, আমিও ভাবিনি। ডেটলার বলার পর বুঝলাম। ট্রান্সমিটারটা ভয়েস-অপারেটেড। তারমানে, আমরা যখন ট্রাংক থেকে বের করে সক্রেটিসকে স্ট্যাণ্ডে বসালাম, যা যা কথা বলেছিলাম, সব ট্রান্সমিট হয়ে যাচ্ছিলো। ওটার রেঞ্জ পাঁচশো গজ।

'ইয়ার্ডের কাছেই মহিলা সেজে গাড়িতে বসেছিলো ডেটলার। আমরা যা বলছিলাম, রিসিভারের সাহায্যে সব শুনতে পাচ্ছিলো। হাঁচিটা ইচ্ছে করে দেয়নি, হঠাৎ এসে গিয়েছিলো।

'রাত্রে, গাড়িতে বসেই কথা বলেছে। আমার ঘরে আমার কাছে মেসেজ ট্রান্সমিট করেছে। চোখ রাখছিলো। যখন দেখলো আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছি, অন্ধকারে শুরু করলো তার ম্যাজিক। আমি তো ভাবলাম, সক্রেটিসই কথা বলেছে।

'পরদিন, চাচী আমার ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলো। জানালা দিয়ে মুখ বের করেছিলো একবার, সেটা দেখে ফেলেছিলো ডেটলার। চাচীর সংগে রসিকতা করার লোভ সামলাতে

পারেনি।'

'তোমার চাচী আবার শোনেননি তো সেকথা?'

'মাথা খারাপ। তাকে কি আর বলি? তাহলে আরেকবার পাহাড়ে হতে হবে ডেটলারকে। ঝাঁটা হাতে গিয়ে তার বাড়িতে উঠবে চাচী।'

হাসলেন পরিচালক। 'যাক, আরেকটা জটিল রহস্যের সমাধান করলে। দেখি, গল্পটা দিয়ে টেলিভিশনের জন্যে একটা ছবি বানানো যায় কিনা।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তো, এরপর কি করবে? আর কোনো কেস আছে হাতে?'

'আপাতত নেই, স্যার। চোখকান খোলা রাখবো। পেয়ে যাবো কিছু না কিছু। তেমন কিছুর খোঁজ পেলে আপনিও জানাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

বিদায় নিয়ে উঠলো ছেলেরা। এগোলো দরজার দিকে।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। ভাবছেন, ইস্, একলাকে যদি অনেকগুলো বছর কমে যেতো তাঁর বয়েস! আবার কিশোর হয়ে যেতেন, মিশে যেতে পারতেন ওদের দলে! কিন্তু তা তো আর হবার নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনে নিলেন আরেকটা জরুরী ফাইল।

Grohon // Adhare Alor Pothojatri

শেষ

ফ্র্যাঙ্ক বম-এর অমর কিশোর-কল্পকাহিনী

ওজের জাদুকর

রূপান্তর : আসাদুজ্জামান

ক্যানসাসের দিগন্তজোড়া রুক্ষ তৃণপ্রান্তরের বুকে বাস করে ছোট্ট মেয়ে ডরোথি। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় একদিন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলে দূরে, বহুদূরে—ধূসর বাস্তব থেকে কল্পনার বহুবর্ণ বিচিত্র জগতে।

বাড়ি ফেরার কোনো উপায় তার জানা নেই। সাহায্য করতে পারে শুধু একজন—মহাশক্তিমান ওয়াল ওজ। হলদে ইটের রাস্তা ধরে শত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে যেতে হবে তারই কাছে।

পিছে পা নয় ডরোথি। শুরু হলো তার আশ্চর্য অভিযান।

সংগ্রহের জন্যে নিকটস্থ বুকস্টলে খোঁজ নিন।